

কাজী এহসানউল্লাহ

স্বর্ণা

সুইটহার্ট-১



সুইটহার্ট-১

কাজী এহসানউল্লাহ্

স্বর্ণা

মেয়েটার নাম সোনিয়া। সিমুল ওকে 'সুইট হার্ট' বলেই ডাকতো। মেয়েটা ভালবাসার কথা শুনলে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যেতো। তবুও সে সিমুলকে ভালবাসলো। মাস্তান.দের হাত থেকে ওকে বাঁচিয়ে সিমুল এলো ওর অনেক কাছাকাছি।

কি এক অজানা কারণে সিমুলকে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যা-খ্যান করলো সোনিয়া। সিমুল অনুরোধ করলো, ওর ভুল ভাঙ্গাবার চেষ্টা করলো—কিন্তু সোনিয়া ক্রমে ক্রমেই হারিয়ে যেতে লাগলো ওর জীবন থেকে।

স্বামী পরিত্যাক্তা নীপা ভাবীর বুকে মাথা গুঁজে কাঁদলো সিমুল। রিনির দেহের উষ্ণ পরশে হারিয়ে গেলো ও। রিনির বান্ধবীদের সাথে মেতে উঠলো মদ নিয়ে। চুরি করলো অনেক টাকা। কিন্তু সোনি ওকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েও ধ্বংস করতে পারলো না। এক সময় বিমান বন্দরে দেখা গেলো সোনিয়া, সিমুল, নিপা ভাবীকে অশ্রুরত-বস্থায়। কিন্তু কেন····· ?

সুবর্ণা প্রকশ কুটির
৫৯, হেমেন্দ্র দাস রোড
সুত্রাপুর, ঢাকা—১১০০

শো-রুম—রজনীগন্ধা প্রকাশনী
সিঁড়ি বই বিতান
৩৬/৯ বাংলাবাজার

'সুবর্ণা'র রোমান্টিক কাহিনী

কেবলমাত্র বড়দের পাঠযোগ্য

সুইট হার্ট

কাজী এহসান উল্লাহ



সুবর্ণা

প্রকাশক : কাজী এহসানউল্লাহ
সুবর্ণা প্রকাশ কুটির
৫৯, হেমেন্দ্র দাস রোড,
সুত্রাপুর, ঢাকা—১১০০

সর্বস্বত্ব : প্রকাশকের

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর—১৯৮৮ ইং

কাহিনী : কাল্পনিক

প্রচ্ছদ : মিজানুর রহমান

মুদ্রণে : জাগ্রত প্রিন্টার্স, ঢাকা।

যোগাযোগ : মোঃ আশরাফুল করিম
সুবর্ণা প্রকাশ কুটির
অথবা
শো-রুম : সিঁড়ি বই বিতান
৩৫/৯ বাংলাবাজার, ঢাকা

এছাড়াও
বড়াল প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ডানা পাবলিসার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
জাকির বুক স্টল, বিউটি সিনেমা
বুলবুল বই ঘর, নারায়নগঞ্জ
বিতরণী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আপনার সংবাদপত্র হকারকে বলুন, আপনি যদি ঢাকার বাসিন্দা হন তাহলে ঘরে বসেই পাবেন। কারণ সংবাদপত্র হকার্স সমবায় সমিতি আমাদের একমাত্র এজেন্ট।

সম্পাদনা : মানিক চৌধুরী

কাহিনী বর্তমানকালকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ কল্পনাশ্রিত। এ কাহিনীর সঙ্গে বাস্তব কোন নাম বা চরিত্রের মিল নেই, সম্পর্কও নেই।

আমার বিশ্বাস, পাঠককুলে 'সুইট ডার্লিং'-এর চেয়েও বেশী সাড়া জাগাবে আমার এই বইটি।

॥ লেখক ॥

এক

দুপুরের তীব্র রোদ। তাকালে চোখে ধাঁ ধাঁ লাগে। ফাঁকা গলি-পথ। ঝকঝকে পরিস্কার কংক্রিটের রাস্তা। গ্রীন রোড থেকে কাজী পাড়ার হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে এয়ারপোর্ট রোডে গিয়ে মিশেছে।

দুপুরের তীব্র রোদ। তাকালে চোখে ধাঁ-ধাঁ লাগে। তবু তাকিয়ে থাকি আমি। হামিদুল হক চৌধুরীর বাড়ির একটা নারিকেল গাছের ছায়া পড়েছে রাস্তায়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ডাবলু, তারেক, কামাল ও আমি এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পা জোড়া টন টন করতে থাকে, বুকের ভেতরেও কষ্ট হয়। অস্থির দৃষ্টিতে বার বার ঘড়ি দেখছিলাম। আড়াইটা বাজে। এখনও দুপুরের খাবার খাইনি। কখন যে খাবো তারও ঠিক নেই। হয়তো বিকেলে না হয় সন্ধ্যার পরে। এমনও হতে পারে আজ আর খাওয়াই হবে না বাসায়। এরকমই জীবন আমার।

দুপুরের তীব্র রোদ। তাকালে চোখে ধাঁ-ধাঁ লাগে। আমি ঘামতে থাকি। আমার বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে। চোখ ধাঁধানো রোদের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকি আমি। এখনই এসে

পড়বে ও। সোয়া দুইটায় স্কুল ছুটি হয়ে যায় ওর। কাজী পাড়া পৌঁছতে পৌঁছতে আড়াইটা বা পৌনে তিনটা বেজে যায়। আমি ওর জন্যে এই পথেই দাঁড়িয়ে থাকি। রোদ, বৃষ্টি, ঝড় কিছুই মানিনা, সোনিয়া যেদিন স্কুলে যাবে, সেদিন দুপুর আড়াইটায় আমি এখানে থাকবোই। এটা ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়ম হয়ে গ্যাছে। অথবা চিরন্তন সত্য হয়ে গ্যাছে। সূর্য যেমন পূব দিকে উদয় হবে, পশ্চিম দিকে অস্ত যাবে। আমিও তেমনি আড়াইটা বাজে এই গলি পথে উদিত হবো, আবার তিনটার আগেই অস্ত যাবো। আমি ওকে ভালোবাসি। ওর জন্যে পারি না, এ্যামন কাজ নেই। আমার বুকের ভেতর ওর জন্যে জমা রেখেছি অনেক অনেক ভালোবাসা। আমার খুব ইচ্ছে করে সোনিয়াকে আমার এই ভালোবাসা ভরা বুকে খুব নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বুঝিয়ে দেই, এই বুকের সব ভালোবাসা তোমার—শুধু তোমারই। তুমি চাও, আমি বুক উজাড় করে ঢেলে দেবো। কিন্তু মেয়েটা বোঝে না। নাকি বুঝও বুঝে না, জানি না। ওকে বড় রহস্যময়ী মনে হয়। ওর কথাগুলোও রহস্যময়। প্রত্যেকটা কথার দু'টো অর্থ থাকে। আমি যে ওকে ভালোবাসি, এ কথা বোঝাবার যত পদ্ধতি আছে, সব ব্যবহার করে দেখেছি। মেয়েটা বোঝে না, বুঝেও বুঝে না কিনা জানি না।

অনেক বারই সাহসী হয়েছি। অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করেছি। সোনিয়ার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি। অনেক কথা, আমার মনের গোপন সব কথা, ওকে বলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারেনি।

বুকের ধড়ফড়ানি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

সেদিনতো একেবারে প্রতিজ্ঞা করেই পথে দাঁড়িয়েছিলাম, আজ সোনিয়াকে কথাটা বলবোই। বলবো—মাই সুইট হার্ট, আমি তোমাকে ভালবাসি। সেদিন পা কেঁপেছে কিন্তু ঠোঁট কাঁপেনি। জিভ আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। শত চেষ্টা করেও আমার সোনিয়াকে সুইট হার্ট বলতে পারিনি।

মনের সাথে যুদ্ধ করে যতটুকু পেরেছি সেটাও পরিস্কার নয়। কুয়াশাচ্ছন্ন। কতটুকু আর কি বোঝাতে পেরেছি তা নিজেও জানি না। ঘেমে নেয়ে বুকের হাতুড়ি পেটাই সহ্য করে একদিন ওর দু'হাতে রক্ত গোলাপ ধরিয়ে দিয়ে বলেছি, 'ভালবাসো ?'

প্রশ্নটা খুবই খোলামেলা। সোনিয়া যদি ভাবে ফুল ভালোবাসার কথা বলেছি, তাহলে ওকে বোঝাতে আমি সত্যিই ব্যর্থ। আর ও যদি ফুলকে না ধরে আমাকে ভালোবাসার অর্থ করে তাহলে হ্যাঁ বা না যে কোনো একটা উত্তর পেয়ে যাবার কথা। কিন্তু মেয়েটা ঠিক কি আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি। আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটু হাসে তারপরে মৃদুস্বরে বলে ধন্যবাদ। আর তখন আমি ওর অতল রহস্যের ভেতর হাবুডুবু খেতে থাকি। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি না।

দুপুরের তীব্র রোদ। তাকালে চোখে ধাঁধাঁ লাগে। তবু আমি স্পষ্ট সোনিয়াকে রিকশায় চেপে আসতে দেখি।

আমার পেছন থেকে ডাবলু ফিস্‌ফিস্‌ করে ওঠে। 'সিমুল এসে গ্যাছে ও, রিকশা থামা।'

হাত নেড়ে রিকশাটা থামার ইঙ্গিত করি আমি। সোনিয়া অপলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর মৃদু স্বরে রিকশাঅলাকে থামাতে বলে।

ওর রিকশার পাশে গিয়ে দাঁড়াই আমি। কি বলবো, কিভাবে বলবো—সব গুলিয়ে যায় আমার ভেতরে। ওকে আজও আমার সরাসরি প্রস্তাব করার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু ওর সামনে গিয়ে কিছুতেই কথাটা বলতে পারি না। আমার বুকের ভেতর দুপদাপ করতে থাকে। নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকি সোনিয়ার মুখের দিকে। সামান্য একটু একটু ঘামছে সোনিয়া। ওর ফর্সা কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। কানের পাশের রেশমী কোমল চুলগুলো ভিজে গালের উপর চেপে বসেছে। পাতলা লাল ঠোঁট। টানা চোখে রাজ্যের সব দুষ্টুমি ঝিকমিক করছে।

'কিছু বললেন সিমুল ভাই?'

আমি চমকে উঠি। তারপর হঠাৎ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি। খুব শান্ত স্বরে বলি। 'তোমার সঙ্গে কথা ছিলো···।'

'প্লিজ, সিমুল ভাই, তাহলে বাসায় আসবেন। এখন খুব বোরিং লাগছে।' অনুনয়ের স্বরে বললো সোনিয়া। তারপর মুখখানা খুব সুন্দর করে কাত করে আদুরে স্বরে বললো, 'আসবেন কিন্তু হ্যাঁ?'

আমি রোবটের মতো নিষ্প্রাণ দাঁড়িয়ে থাকি। মাথা নেড়ে ওর কথার প্রত্যুত্তর করতেও ভুলে যাই। আমার মনে হয় আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা থেমে গ্যাছে। আমি এখন পরলোকে আছি। এই দুপুর আসলে দুপুর নয়। এটা জাহান্নামের আগুন।

সেজন্যেই আমার কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে।

'শালা, গাধা। একটা রাম গাধা।' বিরক্ত হয়ে আমাকে বকতে থাকে ডাবলু।

আমি কিছু বলতে পারি না। আমার মুখটা অবশ হয়ে থাকে। আমার ক্যানো এ্যামন হয়? সোনিয়া তুমি দু'টো মিনিট দাঁড়িয়ে এখানে কথা বললে কি হতো? আমি তো তোমার জন্যে সারা-দিন চৈত্রের সূর্য মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তিনদিন পানি না খেয়ে থাকতে পারি। সিগারেটের আগুন শরীরে চেপে ধরে নিজেকে জ্বালাতেও পারি। কিন্তু তুমি? তুমি আমার জন্যে দু'টো মিনিট এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারলে না?

আমি সোজা হাঁটতে থাকি পুব দিকে। ডাবলু, কামাল দু'জনেই আমার পেছন-পেছন হেঁটে আসে। তারেক সোজা চলে যায় পশ্চিমে। কোথায় কোথায় যে ঘোরে ও, আমি দশ বছর ওর সঙ্গে ডেইলি আড্ডা দিয়েও বুঝতে পারিনি। বন্ধু বান্ধবদের কাছে শুনেছি প্যাথিড্রিনের নেশা করে ও। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করলে বলে না। সুকৌশলে এড়িয়ে যায়।

আরজু'র দোকান থেকে একটা সিগারেট বাকিতে কিনে নিয়ে ধরালাম। শালা এক নম্বরের কৃচ্ছর। এক আনাও বাকিতে বেচতে চায় না। আট আনা পেলেও বন্ধু-বান্ধবদের সামনে চেয়ে বসে। মাঝে মাঝে ওর ওপর মেজাজটা খুব খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছে করে লাথি মেরে ওর শো-কেসটা ভেঙ্গে ফেলি। কিন্তু এটা আমার নিজের এলাকা। নিজের এলাকায় তাফালিং করলে অনেক বিপদ।

ডাংলু নিজের পয়সায় একটা গোল্ডলীফ কিনে ধরাল। তিনজনে আমরা হাঁটতে থাকি। মতিন মিয়ার টি স্টলের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় কামাল পেছন থেকে বলে ওঠে, 'দোস্ত চা খাওয়া।'

থমকে দাঁড়াই আমি। তারপর নিঃশব্দে ঢুকে পড়ি মতিন মিয়ার স্টলে। এখানে ঠেকায় না পড়লে সাধারণতঃ চা খাই না আমি। মতিন মিয়া লোকটা বুড়ো। একটা পাওয়ারী চশমা পরা। লোকটা পেপার পড়তে জানে। পেপারের কি যে বুঝে এই সব গণ্ড মুর্খ লোকগুলো, আল্লায় জানে। একবার পেপার নিয়ে বসলে পঞ্চাশ বার অর্ডার দিলেও কানে শোনে না। এ জন্যেই শালার বুড়ো লোকগুলো আমার এক দম অপছন্দ।

পান সিগারেট আর চা বেঁচে মতিন মিয়া। চা বানাবার সময় অবিরাম হাঁচি দেয় লোকটা। নাক মুখ থেকে ছিটকে ছিটকে চায়ের কাপে জীবাণু যুক্ত ক্যাপিক্যাল পড়ে। আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে।

মতিন মিয়া ঘাড় মুড়ে পেপার পড়ে। আমি হঠাৎ উঠে পড়ি।

'কি হলো?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করে কামাল।

'এখানে নয়। চল আল-রাজীতে গিয়ে বসবো।' বললাম আমি।

'পয়সা আছে তোর কাছে?'

'না।'

'তাহলে?'

'বাকি চালাব।'

'ঘ্যানর-ঘ্যানর করবে মোল্লা।'

'মোল্লার গুষ্টি মারি।'

মেহার ইণ্ডাষ্ট্রীজের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে আল-রাজী হোটেলে গিয়ে বসলাম আমরা তিনজন। আমি, ডাবলু, আর কামাল।

'শোন,' ডাবলু বললো, 'তোরা চুপ থাকবি। আমি অর্ডার দেবো। চা শেষ করে সোজা বেরিয়ে যাবি তোরা। যা হয় আমি দেখবো। আমি অর্ডার দিলে পয়সা চাইবে না।'

'বাবার কাছে কমপ্লেন করবে।' বললাম আমি।

ক্ষেপে গ্যালো ডাবলু। 'সব ব্যাপারে তুই তোর বাপকে এনে দাঁড় করাবি? যা ভাগ। তোকে দিয়ে কিছু হবে না। ছ'মাস ধরে একটা পিচ্চি মেয়ের পেছনে ডিউটি দিচ্ছিস্, এখনও কিছু করতে পারলি না!'

আমি চুপ করে বসে থাকি। শান্ত হয়ে ডাবলু তিন কাপ চা'র অর্ডার দিলো। নিঃশব্দে সবাই চা খেয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ম্যাচেয়ার চেঁচিয়ে উঠলো। 'তিন কাপ চা—সাড়ে চার টাকা!'

আমরা কেউ কথা বলি না। আমার কান খাড়া হয়ে থাকে পেছন থেকে ডাক শোনার আশায়। কিন্তু কেউ ডাকতে সাহস করে না।

সবাই ডাবলুকে ভয় পায় এই মহল্লায়। গার্ডেন রোডের রঙবাজ ও। দুর্ধর্ষ। নিষ্ঠুর। সব সময় একটা সেভেন গীয়ার আর একটা সুইস গীয়ার থাকে ওর কোমরে। থানায় ছয়টা কেস্ আছে ওর নামে। পুলিশ ডেইলি রেইড দ্যায় ওদের বাড়িতে। কিন্তু ডাবলু ভয় পায় না। পুলিশ ডিবি'র নাকের ডগার ওপর

দিয়ে ঘোরাফেরা করে। আসলে ডাবলুকে চেনেনা ওরা। হালকা ছিপছিপে গড়ন। মুখটা সরল। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না য্যানো। কিন্তু ওকে মারামারি করতে জীবনে যে একবার দেখেছে, সে বুঝে নিয়েছে এ ছেলের শরীরে রক্ত মাংস নেই, সব টুকুই প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। নরম বিস্ফোরক। সব সময় বিস্ফোরিত হয় না। কিন্তু একবার বিস্ফোরিত হলে কেঁপে ওঠে পুরো মহল্লা।

রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর ডাবলু বললো, 'চল, এ্যালকোহল মেরে আসি।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'ধুৎ। এখন এই দুপুরে এসব ভালো লাগবে না।'

'তাহলে তুই বাসায় যা।' বললো কামাল।

মাথা নেড়ে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। কামাল আর ডাবলু কাওরান বাজারের কাণ্ট্রি লিকারের দোকানের উদ্দেশ্যে চলে গ্যালো।

দুই

ঘরে ঢুকতেই বাবা চিৎকার করে উঠলেন, 'কোথায় ছিলে তুমি ?'

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আজ কলেজে যাইনি। বাবা শিওর টের পেয়ে গ্যাছে ব্যাপারটা। সংসারে আমাদের মেম্বার সংখ্যা চারজন। চির গম্ভীর, বাবা। সম্পূর্ণ বিপরীত মেজাজের শান্ত মা। বড় ভাই রকিব আর আমি—সিমুল। বাবা রিটায়ার্ড ইঞ্জিনীয়ার। বড় ভাই নিউজ উইকের স্পেশাল করেসপনডেণ্ট। আর আমি হলাম টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার। রেলগাড়ীর চাকায় হাওয়া দেই আর ঘুরিফিরি। সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি তেজগাঁও কলেজে।

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও না ?' হুঙ্কার ছাড়েন বাবা।

আমি গলাটাকে যথেষ্ট নমনীয় করে, বিনয়ে গলে গিয়ে আমতা আমতা করে বলি, 'জ্বী, আমি তো কলেজে···কলেজেই তো ছিলাম।'

'শাট আপ !' দাঁতে দাঁত ঘষেন বাবা।

আমি ফ্রীজ হয়ে যাই।

ভেতর থেকে মা'র শান্ত কণ্ঠ শোনা যায়। 'সিমু ?'

'জ্বী, মা।'

'এদিকে আয়।'

পা পা করে পিছবেটে মায়ের বাধ্য ছেলের মত পর্দা সরিয়ে বাবার সামনে থেকে বেটে পড়লাম।

মা'র রুমে ঢুকতেই আমার মনটা হালকা হয়ে যায়। নামাজের নরম মখমলের জায়নামাজ বিছিয়ে মা হাত তুলে মোনাজাত করেন। আমি দোজা গিয়ে মার সামনে শুয়ে পড়ি। তাড়াতাড়ি মোনাজাত শেষ করে মা জিজ্ঞেস করেন। 'কোথায় কোথায় না খেয়ে ঘুরে বেড়াস, হ্যাঁ?'

আমি গড়ান দিয়ে মা'র কাছে সরে আসি। তারপর মা'র কোলে মুখ গুঁজে চুপচাপ শুয়ে থাকি। আমার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেন মা। দু'চোখে ধীরে ধীরে ঘুম এসে পড়ে আমার। বেশ কিছুক্ষণ পর মা খুব মৃদু স্বরে ডাকেন।

'জ্বী, মা।'

'কোথায় গিয়েছিলি?'

'এই তো মা, হামিদুল হক চৌধুরীর বাড়ির কাছে, রাস্তায়।'

'কি করছিলি ওখানে?'

মা'র কাছে আমি কখনও মিথ্যা বলি না। আসলে মা'র কাছে মিথ্যা বলার দরকারও করে না। মা খুব শান্ত মেজাজের মানুষ। কখনও বকেন না। খুব রেগে গেলে একদম চুপ হয়ে যান। তখন কারো সঙ্গে কথা বলেন না। মা'র কোল থেকে মুখ তুলে বললাম, 'একটা মেয়ের জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'মেয়েদের পেছনে ঘুরিস্ ক্যানো তুই ?'

'মেয়েদেরকে আমার খুব ভালো লাগে যে।'

'ভালো লাগলেও ওদের পেছনে ঘুরবি না।'

আমি আবার চুপচাপ শুয়ে থাকি। মা আমার কান দু'টো নাড় চাড়া করতে করতে জিজ্ঞেস করেন, 'মেয়েটা কে ?'

'এই যে, পাশের বাসার সোনিয়া।'

'কোন সোনিয়া ?'

'ঐ যে, তুমি ভুলে গ্যাছো। প্রত্যেকবার ঈদের সময় যে মেয়েটা তোমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করতে আসে, সেই সোনিয়া।'

মা স্মরণ করার চেষ্টা করতে করতে বলেন। 'কত মেয়েই তো আসে।'

'তুমি ভুলে গ্যাছো। পাশের বাসার যে মেয়েটার চুলগুলো খুব বড় বড়, চোখ দু'টো ড্যাবা ড্যাবা একদম নিষ্পাপ চোহারা। স্কার্ট পরে। ওই মেয়েটার কথাই বলছি।'

'ওকে আমাদের বাসায় আসতে বলিস তো।'

'ওকে বিয়ে করতে চাই আমি। তুমি রাজী ?'

'পাগল।' মা হাসতে থাকেন।

'বলো না, মা ?'

'চুপ কর তো তুই। তোর বড় ভাই বিয়ে করেনি, আর তুই এখনই বিয়ে বিয়ে করছিস্ ?'

'এখন না তো। বিয়ে তো করবো বছর পাঁচেক পর। তবে তুমি যদি রাজী থাকো, তাহলে ওর সঙ্গে আমি প্রেম করবো।'

মা হা-হা করে হাসতে থাকেন। আমার দু'কান ধরে টানতে টানতে বলেন। 'পাগল, একদম পাগল। তোকে নিয়ে আমার যত ঝামেলা। কোথায় যে কি করে বসিস্।'

আমি উঠে বসি। মা বলেন, 'যা তোর খাবার ঢাকা আছে টেবিলে। খেয়ে ফেল।'

আমি তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ি। তারপর একদম দিগম্বর হয়ে শাওয়ারের নিচে ভিজতে থাকি। দিগম্বর হয়ে গোসল করতে আমার খুব ভালো লাগে। অনেকদিন ধরে অভ্যাস করে ফেলেছি।

বিকেল পাঁচটার দিকে ছাদে উঠতেই দেখলাম সোনিয়াও ছাদে উঠেছে। কালো স্কার্টের ওপর সাদা জামা পরেছে সোনিয়া। ওর ফর্সা পা দু'টো দেখা যাচ্ছে। আমার মাথাটা মেয়েদের ফর্সা পা দেখলেই আচমকা গরম হয়ে যায়। কেবল মনে হয় আরেকটু ওপরে ওর পা দু'টো জানি ক্যামন হবে। নিশ্চয় মাখনের মতো নরম আর উপাদেয়। আরেকটু ওপরে···ভাবতেই মাথা গুলিয়ে ওঠে।

ঝিরঝিরে হাওয়ায় সোনিয়ার লম্বা চুলগুলো বাতাসে ওড়ে। আমার ইচ্ছে করলো, এ বাড়ির ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে ওদের ছাদে গিয়ে সোনিয়াকে জাপটে ধরি। ওর হালকা পাতলা শরীরটা শক্ত করে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ওর পাতলা মিষ্টি ঠোঁটে ছোটো ছোটো চুমো দিয়ে আদর করি।

ছাদের ওপর হাঁটতে হাঁটতে আচমকা আমাকে দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়ালো সোনিয়া। বাতাসে ওর চুল উড়ছে। টানা চোখে আমাকে দেখলো ও। তারপর খুব মিষ্টি করে হেসে ছাদের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো।

মাত্র গজ দু'য়েক দূরে ওদের ছাদ। আমি এগিয়ে গিয়ে নিজেদের ছাদের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। সোনিয়া হেসে বললো, 'আজ খুব বাতাস তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি ঘুড়ি ওড়াতে জানেন?'

'না।'

'ধাৎ, আপনি কিছুই জানেন না।'

আমি চুপচাপ চেয়ে থাকি ওর দিকে। সোনিয়ার কোমরটা চিকন। পাছাটা খুব ডেভোলপড্। বুকের শালগম দু'টো ঢাকে না সোনিয়া। ঢাকার চাইতে দেখাতেই বেশি ভালোবাসে ও। আর আমি দেখার চাইতে হাতে নিয়ে খেলতেই বেশি ভালোবাসি। কিন্তু মেয়েটার চেহারা যত ইনোসেন্টই হোক না, নাম্বার ওয়ান হারামি আমার কাছে আসতে চায় না। গত মাসে আপার জন্মদিনে ভিড়ের ভেতর আমার খুব ইচ্ছে ছিলো ওর বুকে হাত ছুঁয়ে দেখবো। কিন্তু মেয়েটা আমার চোখের দিকে তাকিয়েই য্যানো পুরো প্ল্যানটা বুঝে ফেললো। চট করে সরে গিয়ে মা'র কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বহু চেষ্টা করলাম, পারলাম না। সব মেয়েরাই কি এ রকম নাকি বুঝতে পারি না। ছেলেদের চোখের দিকে

তাকিয়েই নাকি মেয়েরা অনেক কিছু বুঝে ফেলে।

'সিমুল ভাই?'

'কি?'

'আপনি ক্রিকেট খেলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি অলরাউণ্ডার?'

'না।'

'ব্যাট্‌স্‌ ম্যান?'

'না। আমি বোলার।'

'ক্যানো, আপনি ব্যাটিং করতে পারেন না?'

'পারি, কিন্তু মজা লাগে না আমার।'

'বোলিং করতেই খুব মজা লাগে আপনার, না?'

'হ্যাঁ।'

'বোলিং করতে আপনার ভালো লাগে ক্যানো?'

'ক্রিকেটের বল আমার খুব ভালো লাগে। গোল গোল যে কোনো জিনিসই আমার খুব প্রিয়। হাতের মুঠোয় ধরতে খুব ভালো লাগে।'

'আপনি রাস্তায় কি য্যানো বলতে চেয়েছিলেন।' স্মরণ করিয়ে দিলো সোনিয়া।

'হ্যাঁ। শুনবে?'

'বলুন।'

আমি ওর কথায় বেশ উৎসাহ বোধ করলাম। যে কথাটা এত

দিন খুব কষ্টকর মনে হতো এখন খুব সহজ মনে হচ্ছে। 'অনেক দিন থেকে তোমাকে কথাটা বলবো বলবো করেও বলিনি।'

'বলেই ফেলুন।' আগ্রহ প্রকাশ করলো মেয়েটা।

'তুমি শুনে রাগ করবে না তো?'

'মোটেও না।'

'আমি তোমাকে খু উ-ব ভালোবাসি। তুমি আমার সুইট হার্ট।'

চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো সোনিয়া। আমার বুকের ভেতর ধড়ফড় করতে লাগলো। অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো সোনিয়া। কিছু বললো না।

'সনি?' কাঁপা কণ্ঠে ডাকলাম।

'ধ্যাৎ। আমি নেমে যাবো কিন্তু।'

'সনি, প্লিজ প্লিজ।'

'এসব আমার ভালো লাগে না।'

'আমি যে তোমাকে খুব ভালোবাসি।'

'এসব পারবো না আমি।' বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়ালো সনি। আমার বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়িটা দ্রুততর হতে লাগলো।

'সনি। মাই সুইট হার্ট।' পেছন থেকে ডাকলাম।

ঘুরে দাঁড়ালো সনি। মুখটা মলিন।

'সনি, যেও না প্লিজ।'

'আপনি এসব বললে চলে যাবো কিন্তু।'

'ঠিক আছে বলবো না। তবু তুমি দাঁড়াও। তোমাকে আমি

দেখবো। তোমাকে দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।'

'থামুন তো!' কপট বিরক্তির স্বরে ধমক মারলো সোনিয়া।

আমার বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠলো। আমার যদি একটা বউ থাকতো। এরকম পিচ্চি বউ। কথায় কথায় আমাকে সনির মতো করে ধমকাতো। আমার হার্ট বিট বাড়তে লাগলো। মৃদু স্বরে ডাকলাম। 'সনি?'

'কি?'

'রাগ করেছো?'

'না।'

'তুমি রাগ করলে আমার খুব কষ্ট হবে।'

'এসব বলবেন না। বললে খুব রাগ করবো।'

'আচ্ছা-আচ্ছা, বলবো না। তবু তুমি দাঁড়াও। তোমাকে দেখলে আমি সব ভুলে যাই।'

'আবারও বলছেন?'

'না-না, আর বলবো না। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবো তোমাকে।'

ছাদের রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো সনি। বাতাসে ওর লোকাট স্কার্টটা ফুলে উঠছে। চুলগুলো উড়ছে।

'সিমুল ভাই?'

'বলো।'

'আপনার কি হয়েছে আজ?'

'অসুখ। মনের অসুখ। আমার অসুখের নাম সোনিয়া।'

'আপনি সত্যিই আজ বাজে বকছেন।'

'বাজে বকছি?'

উত্তরে কিছু বললো না সনি। চেয়ে দেখলাম সনির ইমিডিয়েট বড় বোন রিনি, ছাদে উঠে এসেছে। ওরা মোট চার বোন। হানি, জিনি, রিনি আর সনি। ওদের কোনো ভাই নেই। বাবা ব্যাংক অফিসার। মা টি.ভি. স্টার। নাটকে অভিনয় করে। ওরা সবাই মায়ের মতো হয়েছে। মডার্ন আর খুব এট্র্যাক্‌টিভ। সনির চেহারাটা এক দম ইনোসেন্ট। রিনির চেহারাটা দারুণ সেক্সি। ওকে দেখলেই আমার রক্ত গরম হয়ে যায়। পাছা আর বুকের সাইজ দেখলে মাথা ঠিক থাকে না। জিনি খুব ভদ্র। নম্র, মার্জিত চেহারার। হানির চেহারাটাও দারুণ। বড় ভাইয়ের সঙ্গে হট কানেকশান ছিলো ওর। পরে অন্যখানে বিয়ে হয়ে গ্যাছে। বিয়ের পরও সম্পর্কটা রয়েছে ওদের। একটা বাচ্চা আছে হানির। ছেলে। দেখতে ঠিক ভাইয়ার মতো। আমি শিওর বাচ্চাটার মূল জন্মভূমি আমাদের ড্রইং রুম। ভাইয়া দারুণ মৌজ করতো হানিকে নিয়ে। এখনও করে।

তিন

স্কুলের গেটে কোনো দিন দাঁড়াইনি। প্রেস্টিজে বাধে। কিন্তু প্রেমে পড়লে আর প্রেস্টিজ সেন্স থাকে না। আমার অবস্থাও তাই।

ছুটি হয়ে গ্যাছে স্কুল। এক সঙ্গে তিন চার শ' মেয়ে হুড়মুড় করে স্কুলের মাঠে নেমে পড়েছে। এ করম গরুর পালের মতো। সব এক ড্রেস। ভালো করে না তাকালে চেনা মেয়েটাকেও খুঁজে নিতে কষ্ট। এক সঙ্গে এ্যাতোগুলো জিনিস আগে কখনও দেখিনি। সবগুলোকেই সুন্দর লাগছে। কোনটা রেখে কোনটা দেখবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কারো ভারী বুক, কারো উঁচু নিতম্ব। কারো ঘাড় গর্দান সমান, কি মোটা। কারো ওড়না বেসামাল। কানটা ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিলো মেয়েদের কিচির-মিচির শব্দ শুনতে শুনতে। মেয়েরা যে এ্যাতো কথা বলতে পারে, আগে জানতাম না। কথাতো নয় সব প্যাচাল। এই অবস্থা দেখলে কোন শালা বলবে এরা অবলা? বরং বিরতিহীন ক্যাসেট।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম প্রত্যেকটা মেয়েকে একবার একবার দেখে নেবো। কিন্তু দেখতে গিয়ে বুঝতে পারলাম সবগুলোকে দেখছি না। একেকটা গ্রুপ থেকে সবচে' সুন্দরী মেয়েটাকে দেখে নিচ্ছি।

নয়তো সবচে' উঁচু বুক মেয়েটার বুকে গিয়েই আমার চোখটা জোঁকের মতো জমে যাচ্ছে ক্ষণিকের জন্য।

ডাবলু পেছন থেকে ফিস্‌ফিস করে বললো, 'সিমু-সিমু, এই মেয়েটার পাছা দেখ। জীবনে এত বড় দেখিসনি।' চেয়ে দেখলাম আরিস শালার, এ্যাতো অল্প বয়সে পাছাটা এ রকম পাউরুটির মতো ফুলে উঠলো কি করে? বুকের দিকে তাকালাম। মা-আ-শ আল্লা। এই জাম্বুরা ফল কে খাবে!

ভাবতে গিয়ে হাসি পেলো। আমার চোখদুটো জীবনেও এ্যাতো ব্যস্ত হয়ে কিছু দেখেনি। প্রত্যেকটা মেয়ের উপর এক সেকেণ্ড এক সেকেণ্ড করে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমার ভেতরে ভেতরে একটা কষ্টের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এ্যাতোগুলো সুন্দরী মেয়ে দেখলাম। কোনোটাকেও মনের গভীরে নিতে পারলাম না। আমি ভিড়ের মধ্যে যাকে খুঁজছি, সে কোথায়? কোথায় আমার চিড়িয়া? আমার জানের জান সোনিয়া? মাই ভেরী ইনোসেন্ট সুইট হার্ট। নাকি বিটার হার্ট?

এক সময় আমি ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। নেই, সোনিয়া নেই। ও কি আজ স্কুলে আসেনি? হোয়ার আর ইউ, মাই লাভ? মাই সুইট হার্ট?

মনটা খারাপ হয়ে গ্যালো। আমি আর ডাবলু মেয়েদের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। হঠাৎ ডাবলু বললো, 'ওই যে। ওই যে।' এমনভাবে হাত উঁচিয়ে দেখাচ্ছিল যেন, নতুন একটা গ্রহ আবিষ্কার করে ফেলেছে।

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে ডাবলুর হাতের ইঙ্গিত অনুসরণ করে রাস্তার ওপাশের আইল্যাণ্ডের দিকে তাকালাম। একটা রিকসা খুঁজছে সোনিয়া। অনেকগুলো স্ট্রীট রমিও দাঁড়িয়ে আছে ওর চারপার্শ্বে। ওরা আমাদের চেয়ে ভিন্ন। আমাদের টার্গেট নির্দিষ্ট। ওদের সবগুলোয়—কানামাছি ভো ভো যাকে পাবি তাকে ছো।

এই প্রথম বুঝলাম সোনিয়া সত্যিই কত সুন্দর। এ্যাতো মেয়ে স্কুল থেকে বাসায় ফিরছে, কিন্তু সব রমিও গিয়ে ঘুর ঘুর করছে আমার চিড়িয়ার পেছনে। আসলে সত্যিই ও অন্যন্যা। আমার এ ধারনাটা আবেগপ্রবণও হতে পারে। কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল, সব রোমিওরাই আমার জুলিয়েটকে দেখছে।

আমি দ্রুত রাস্তা ক্রস করে সোনিয়ার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'হ্যালো, সনি?'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো সনি। চোখে চোখে অবাক হয়ে দু' সেকেণ্ড চেয়ে থাকলো। তারপর দু'পা এগিয়ে এসে ঠোঁট উল্টে অভিমানের সুরে বললো, 'দেখুন তো সিমুল ভাই, একটা ছেলে আমার খাতা ধরে টান দিয়েছে।'

'কোন ছেলেটা?'

'ওই যে, ওই যে,' হাত তুলে ফেইড জিনসের শার্ট পরা একটা ছেলেকে দেখিয়ে দিলো সোনিয়া।

আমি কিছু বলবার আগেই প্যাণ্টের বেল্টে হাত দিয়ে সবার সামনে একটা সেভেন গিয়ার বের করে আনলো ডাবলু। এদিক

ওদিক তাকালো, 'কোনটা—কোন ছেলেটা ?'

কড়মড় শব্দ করে সেভেন গীয়ারের ব্লেডটা টেনে বের করলো ডাবলু।

জিনসের প্যান্ট পরা ছেলেটাকে ভিড়ের ভেতর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে দেখে হেসে ফেললো সোনিয়া। ফাঁকা হয়ে গ্যালো পথটা। সব শালা কেটে পড়েছে। আমি বললাম, 'আর আসবে না ওরা।'

'আমাকে একটা রিকশা ভাড়া করে দিন,' বললো সোনিয়া।

একটা রিকশা ডাকলাম। ভাড়া জিজ্ঞেস না করেই সনিকে রিকশায় উঠতে বললাম।

টেন-এ পড়ে সনি। ওর হাতে ইংরেজীর বই আর একটা খাতা। রিকশায় উঠে একপাশে বসলো ও। আমি রিকশাঅলাকে পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়ে বললাম, 'গার্ডেন রোড পৌঁছে দাও।'

'আপনিও চলুন না।' আমার চোখে চোখ রেখে মিষ্টি সুরে বললো সনি। আগের মতো ঠোঁট উল্টে। ওর রাঙা পাতলা ঠোঁট দু'টো ওল্টানো দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। বোম্বের নায়িকা শ্রীদেবীর চেয়ে বেশী সুন্দরীও মনে হয়। তখনই মনে হয়, সোনিয়া ইজ মাই সুইট হার্ট।

আমার বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠলো। সনির সঙ্গে এক রিকশায়—ওরে বাপরে বাপ, যদি হার্টফেল করি। ওকে দুর থেকে দেখলেই আমার হাঁটু কাঁপতে শুরু করে।

আমি ইতস্তত: করে বললাম, 'আমার ফ্রেণ্ড আছে যে সঙ্গে।'

'তাতে কি, ওকে আরেকটা রিকশায় আসতে বলুন না।'

চোখ টিপে দিলাম ডাবলুকে। তারপর উঠে বসলাম সনির পাশে। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে হার্ট বিট বাড়তে শুরু করলো আমার। সনির এ্যাতো কাছাকাছি আর কোনো দিন আসিনি। রিকশা চলতে শুরু করেছে। সনির স্যাম্পো করা চুল উড়ছে বাতাসে। ওর চুলের খোপাটা খুলে লম্বা চুলগুলো আমার গলায় পেঁচাতে খুব ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু সনির কাছে এসব বললে সোজা রিকশা থেকে নেমে যাবে। নয়তো আমাকে নামিয়ে দেবে। দু'টোই আমার জন্য বেদনাদায়ক।

চুপচাপ বসে থাকলাম। সনির শরীর থেকে মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে। ওর কাঁধ আর কোমরের কিছু অংশ আমার শরীরের সঙ্গে লেগে রয়েছে। আমার আঠার বছরের যুবক শরীর টগ-বগ করে রক্ত ফুটতে শুরু করলো। আমার খুব ইচ্ছে করলো ওর কোমরের কাছটায় হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি। ও জায়গাটা নিশ্চয়ই খুব নরম লাগবে কিন্তু সাহস হলো না। সনির কোলের দিকে তাকালাম। এ্যাতো সুন্দর হয় মেয়েদের কোল—জানতাম না। রিকশার মধ্যেই আমার ইচ্ছে করলো ওর কোলে শুয়ে পড়ি।

'সিমুল ভাই?'

'উম্।' চমকে উঠলাম ওর ডাকে।

'আপনি স্কুলের গেটে যান ক্যানো?' ওর ড্যাবড্যাবে মায়া ভরা দু'টো চোখেও প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখতে পেলাম। এমনিতেই ওর চোখ দু'টো খুব সুন্দর।

'তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম।'

'স্কুলের গেটে দাঁড়ানো খারাপ।'

'জানি।'

'তবু যাও ক্যানো?'

'তোমাকে যদি অন্য কেউ কেড়ে নিয়ে যায়? আমি তোমাকে সব সময় গার্ড দেবো। তোমাকে না দেখলে আমার মাথাটা একদম খারাপ হয়ে যায়।'

সোনিয়া কিছু বলে না। ওর ঠোঁটে একটা সুক্ষ হাসি ঘোরা-ফেরা করে। আমি ওর মুখের দিকে তাকাতেই মুখটা গভীর করে ফেলে সনি।

মিনিট খানেক চুপচাপ বয়ে যায়। তারপর আচমকা সনি প্রশ্ন করে। 'আপনি সত্যিই আমাকে গার্ড দেবেন তো?'

'হ্যাঁ। তোমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখবো আমি। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। হউ আর মাই সুইট হার্ট।'

'ধ্যাৎ! বার বার ঐ পুরনো কথাটা বলেন ক্যানো?'

'কি বলবো বলো?'

'অন্য কিছু বলতে পারেন না?'

'তোমাকে না পেলে বাঁচবো না।'

আচমকা হাত তুলে আমার চুল খামচে ধরলো সনি। এমনিতেই আমার কানের কাছের চুলগুলো বড়। ইচ্ছা করেই রেখেছি। সনি ঠিক এখানে খামচাবে জানলে রাখতাম না।

'আপনি যে কি! এ্যাতো বাজে বকেন ক্যানো?'

'সনি, তুমি একবার বলো—তুমি আমার। একবার আমাকেও সুইট হার্ট বলে সম্বোধন করো।'

'এসব ভালো লাগে না আমার।'

'বিশ্বাস করো আমি তোমাকে···।'

সনি আমার মুখ চেপে ধরলো। তারপর খুব শাসনের ভঙ্গিতে ধমকালো। 'চুপ্।'

আমি একদম চুপ হয়ে গেলাম। মিনিটখানেক পর সনি বললো, 'কাল আসবেন?'

'কোথায়?'

'স্কুলের সামনে।'

'তুমি যদি বলো তাহলে চলন্ত ট্রেনের সামনেও যেতে পারি।'

হেসে ফেলে সনি। আমি চেয়ে চেয়ে ওর হাসিটা দেখি।

সনি বললো, 'আসবেন। ওই ছেলেগুলো আমাকে খুব জ্বালায়।'

'ওদেরকে একটা চরম শিক্ষা দিয়ে দেবো।'

'আপনি ওই ছেলেটার সঙ্গে চলেন ক্যানো?' আচমকা প্রশ্ন করলো সনি।

'কোন ছেলেটা?'

'ওই যে, কি নাম য্যানো—ডব্লিও

হেসে ফেললাম। 'ডব্লিও না, ওর নাম ডাবলু।'

'ইস চাকুটা বের করলো কিভাবে। আমি প্রথমে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য খুব ভালো হয়েছে। ওই ছেলেটা ডেইলি আমাকে টিস্ করে।'

'আর করবে না। ডাবলুকে দেখেছে তো—জীবনেও আসবে না।'

'আপনি ডাবলুর সঙ্গে ঘোরেন ক্যানো?'

'ডাবলুকে তুমি চেনো না,' মৃদুস্বরে বললাম। 'ও এমনিতে যথেষ্ট ভদ্র। একটু আধটু বজ্জাতী করে কিন্তু নিরীহ কারো ক্ষতি করে না। তোমার খাতা ধরে যে ছেলেটা টান মেরেছিলো। এ ধরনের ছেলেদের সাথেই ওর সংঘর্ষ হয়।'

একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে গ্যাস লাইটারটার জন্যে পকেটে হাত দিলাম। সনি ছোঁ মেরে সিগারেটটা নিয়ে গ্যালো। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো। আমি থ' হয়ে চেয়ে থাকলাম ওর দিকে।

'এ্যাতো অল্প বয়সে সিগারেট খান ক্যানো?'

'খেলে ক্ষতি কি?'

'বিশ্রী লাগে আমার কাছে।' নাক সেটকালো ও।

'টেনশনে থাকলে খেতে হয়।'

'কিসের টেনশন আপনার?'

কিসের টেনশন—কি করে বোঝাবো যে, ও নিজেই আমার সবচে' বড় টেনশন। ওর শরীরের কোমল আগুন আমাকে যে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে ছাই করে দিচ্ছে—সে তো জানে না। ওর নিষ্পাপ চেহারা। ওর অবুঝ, সরল চাহনী। ওর বুকের নরম ঢেউ। এসব ওর কাছে হয়তো আজও অর্থহীন। ও হয়তো জানে না, এসব অর্থহীন ব্যাপারগুলো একটা পুরুষের জন্যে কত অর্থবহ।

রিকশা এসে থামলো বাহাত্তি নম্বর বাড়ির সামনে। সনি ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নামলো। আমিও নামলাম। দু'জনের পাশাপাশি বাসা। আমি ডান দিকের গেট দিয়ে ঢুকবো, সনি বাম দিকের গেট দিয়ে।

হাতের খাতা দিয়ে আমার ঘর্মাক্ত মুখে বাতাসের ঝাপটা দিলো সনি। দুষ্টুমির হাসি ওর ঠোঁটে। 'আসি হ্যাঁ?'

'আচ্ছা।'

ঠোঁট জোড়া সরু করে আমাকে চুমু খাওয়ার ভঙ্গি করলো সনি। পরমুহূর্তে দৌড়ে চলে গেলো, য্যানো আমি তাড়া করবো ওর পিছে পিছে।

কিন্তু আমি তাড়া করি না। আমি জাস্ট ফ্রীজ হয়ে যাই। আমার পা দু'টো য্যানো অবশ হয়ে গ্যাছে। এ্যাতো সুন্দর করে কেউ কখনও ফ্লাইং কিস দেয়নি আমাকে। ঠোঁট সরু করার মুহূর্তে ওকে অদ্ভুত লাগছিলো। আমার ইচ্ছে করছিলো, তখনি ওকে জাপ্টে ধরে, হয় ওর বুকে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলি, না হয় ওকে নিজের বুকে চেপে ধরে একদম বিলীন করে দেই।

এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

চার

তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরেছি আজ।

বাবার রুমে উঁকি দিলাম। শুয়ে শুয়ে নিউজ উইক পড়ছেন। ভাইয়ের লেখা রিপোর্টটাই পড়ছেন হয়তো। দুপুরের খাওয়া শেষে ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস বাবার। না পড়লে নাকি তার ঘুম আসে না। আর এই সময়টা মা নামাজের বিছানায় বসে অপেক্ষা করতে থাকেন আমার জন্য। আমার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসেই থাকেন। তারপর উঠে গিয়ে শুয়ে পড়েন। যেদিন দুপুরে আমার খাওয়া হয় না, সেদিন মা'রও খাওয়া হয় না, বুঝতে পারি।

খেতে খেতেই লক্ষ্য করলাম মা আসছেন। নামাজের সাদা শাড়িটা বদলে একটা ধূসর রঙের শাড়ি পড়েছেন মা। ভারী শরীর নিয়ে খুব একটা হাঁটা-চলা করতে পারেন না। সারাদিন বাড়িতেই শুয়ে-বসে কাটান। নামাজ পড়েন দীর্ঘ সময় নিয়ে। সেজদা দিলে ওঠেন দেরীতে। মাঝে মাঝে সেজদায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেও দেখেছি মাকে।

খুব ধীরে ধীরে পা ফেলে আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন মা।

তারপর নিঃশব্দে বসে পড়লেন পাশের চেয়ারে। প্লেট থেকে মুখ তুলে মার দিকে তাকালাম। লক্ষ্য করলাম কি একটা কথা বলতে চান ম্যানো। এক গ্লাস পানি তুলে নিয়ে অর্ধেকটা খেয়ে বললাম, 'ঘুমোতে যাওনি, মা?'

'না। একটা কথা বলতে এসেছিলাম তোকে।'

'কি?'

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন মা। তারপর আমার চেয়ারের ব্যাকরেস্টে একটা হাত রেখে খুব নিচু স্বরে বলেন, 'তোর ভাই কলেজে গিয়েছিলো।'

চমকে উঠলাম আমি। 'তারপর?'

'তুই নাকি গত বিশ দিনে একদিনও কলেজে যাসনি?'

আমার গলায় ভাত আটকে যাবার দশা হলো। 'ভাইয়া কিছু বলেছে বাবাকে?'

'আমি বলতে বারন করেছি। শুনলে তোর বাপ এ্যাতোক্ষণে··· ?'

আমি লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরলাম মাকে। 'মা, সত্যিই তুমি বাঁচালে আমাকে।'

'ছাড় তো, গিয়েছিলি কোথায়?'

'ওই মেয়েটার কাছে।'

'কোন মেয়েটা?'

'কালকেই তো বললাম তোমাকে। তোমার কিছু মনে থাকে না।'

স্মরণ করার চেষ্টা করেন মা। আমার চোখের দিকে চেয়ে

থাকেন। তারপর আমার ঘাড়ের পেছন দিয়ে হাত দিয়ে কাছে টেনে বলেন, 'তুই সিগ্রেট খাস? তোর মুখে সিগারেটের গন্ধ।'

'মাঝে মাঝে খাই।'

'আর খাবি না। সিগারেট খাওয়া ভালো না।'

'কিন্তু দুপুরের খাওয়ার পরে একবার খেতে যে খুব ইচ্ছে করে?'

'শুধু একটা খাবি।'

'এখন ধরাবো? তুমি মাইণ্ড করবে না তো?'

'ধরা। কি সিগারেট খাস তুই?'

'গোল্ডলীফ।'

সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত দিলাম। কিন্তু প্যাকেটটা পকেট থেকে বের করে আনতে গিয়ে ইতস্তত: করতে লাগলাম। জানি, কিছু মনে করবেন না মা। কিন্তু মা'র সামনে কখনও সিগারেট ধরাইনি। পকেট থেকে খালি হাত বের করে আনলাম।

মা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। মিনিট দু'য়েক পর মা বললেন, 'কলেজে যাবি কাল থেকে।'

'আচ্ছা।'

'ওই মেয়েটার কাছে গিয়েছিলি না?'

'হ্যাঁ।'

'কি করে মেয়েটা? কি নাম য্যানো?'

'সোনিয়া। টেন-এ পড়ে।'

'ওর পেছনে ঘোরা ছেড়ে দে।'

'ক্যানো, ওকে যে আমি ভালোবাসি।'

'এসব খারাপ। নষ্ট হয়ে যাবি তুই।'

'নষ্ট হবো না, মা। ওর সঙ্গে আমার প্রেম হয়ে গেলেই আগের মতো ভালো করে পড়াশুনা আরম্ভ করে দেবো।'

মার গম্ভীর মুখে একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ে। আমার চোখের দিকে চকচকে দৃষ্টিকে চেয়ে থাকেন তিনি। তারপর খুব নিচুস্বরে ফিস ফিস করে বললেন, 'মেয়েটাকে নিয়ে আসতে পারিস না?'

'কোথায়?'

'বোকা—আমার কাছে নিয়ে আসবি ওকে। আমি দেখবো।'

'তুমি দেখেছো তো ওকে। পাশের বাসার সোনিয়া।'

মা আবার স্মরণ করার চেষ্ট করেন। মা'র এই এক দোষ। কারো চেহারাই খেয়াল থাকে না মা'র। আর ঘর থেকে বেরোন না বলে পাশের বাসার লোককেও ঠিক মতো চিনতে পারেন না।

আমার নিজের বোন নেই। মা'র এই এক দুঃখ। প্রায়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—তোর যদি একটা বোন থাকতো। মেয়েদের প্রতি সাংঘাতিক দুর্বলতা তাঁর। বাসায় কোনো মেয়ে ফোন করলে মা'র আর হুঁশ থাকে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে কথা বলে কাটিয়ে দিতে পারেন। ক্লাশের একটা মেয়ে একবার ফোন করেছিলো বাসায়। মা রিসিভ করলেন। তারপর ওর নাম, ঠিকানা, পড়ালেখা, স্কুল—চৌদ্দগুষ্টির খবর নিয়ে ডেইলী তিনবার ফোন করার অনুরোধ জানিয়ে তারপর টেলিফোন ছেড়েছিলেন।

'কই সিগারেট ধরালি না?' জিজ্ঞেস করেন মা।

হেসে ফেলি। তারপর জড়িয়ে ধরে ফেলি মাকে। মা'র কোলে

ঘুমাতে মজাই লাগে আমার। কোমল আর উষ্ণ মা'র কোল। মাথা ছোঁয়ালেই ঘুম এসে পড়ে। মা বারণ করেন না, মাথার চুলগুলো নেড়েচেড়ে দেন।

'তোর লজ্জা করছে, না ?'

'হ্যাঁ।'

'কি হবে, ধরা একটা। ক'দিন পরে মরে যাবো। তখন তোর সিগারেট খাওয়া কে দেখবে।'

সোজা হয়ে বসলাম। 'তোমার শরীর খারাপ, মা ?'

'না। ক্যানো ?'

'তুমি মরে যাবার খবরটা কোথায় পেলে ?'

হেসে ফেলেন মা। 'এমনিই বললাম। মানুষ বুড়ো হলে মরে যায় না ?'

'যায়। কিন্তু তুমি তো বুড়ো হওনি এখনও।'

'বুড়ো হওয়ার আগেও তো মানুষ মরে। আমার তো হার্টের রোগ—কখন মরে যাই ঠিক আছে।'

একটা সিগারেট ঠোঁটে চাপলাম। ম্যাচের কাঠি জ্বালতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম আমার হাত কাঁপছে। মা নিঃশব্দে লক্ষ্য করে উঠে দাঁড়ালেন। আমি ঘামতে শুরু করলাম। নিজের রুমে গিয়ে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম খাটে।

মানি ব্যাগটা ফাঁক করে দেখলাম একটা সিকিও নেই। জানতাম এক পয়সাও নেই, তবু খুলে দেখলাম। পয়সার সোর্স আমার

একটাই —মা। কিন্তু সকালবেলা বিশ টাকার একটা নোট নিয়েছি মা'র কাছ থেকে। এখন চাইতেও সাহস হয় না। কিছু বলবেন না মা, তবে জানতে চাইবেন কি করি টাকা দিয়ে। মনে পড়লো, মা সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটা জেনে গ্যাছে। একটা নতুন কজ পাওয়া গ্যালো।

ঘড়ি দেখলাম, বিকেল পাঁচটা। মা'র রুমে উঁকি দিলাম। এক গ্লাস দুধ শাড়ির আঁচলে জড়িয়ে একটু একটু করে খাচ্ছেন মা। চোখাচোখি হলো।

'ভেতরে আয়।'

'টাকা হবে, মা?'

'কত?'

'বিশ-ত্রিশ পঞ্চাশ, যা দাও।'

'দুধ খাবি একটু?'

'না না, আমার টাকা দরকার।'

'কি করবি?'

'সিগারেট কিনবো এক প্যাকেট। আরও কত ধরনের খরচ আছে না?'

দুধের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন মা। 'বস, দেখি।'

রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন মা। একটু পর ফিরে এলেন। ডান হাতটা শাড়ির আঁচলে লুকানো। আমার সামনে এসে হাতটা বের করলেন। এক প্যাকেট পাঁচ শ' পঞ্চান্ন সিগারেট মা'র হাতে।

'বাবার স্টক থেকে মেরে দিয়েছো, মা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'চুপ! টাকা নেই। এটা নিয়ে যা।'

'বাবা টের পেলে সার্চ ওয়ারেন্ট বের করবে, জানো?'

'সেটা আমি দেখবো।'

'ঠিক আছে। কিন্তু মিনিমাম দশ টাকা ক্যাশ না হলে ঘর থেকে বেরোনো যায় নাকি?'

'তোর জ্বালায় আর পারা গেলো না।'

চোখে-মুখে স্নেহসুলভ বিরক্তির ছাপ ফেলে নিজের আলমীরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মা। আঁচল থেকে চাবিটা খুঁজে নিয়ে খুললেন। চকচকে একটা বিশ টাকার নোট তাজা বাণ্ডিল থেকে খসিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

ছোঁ মেরে নোটটা নিয়ে দ্রুত এগোলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামছি। সামনে একটা মেয়ে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। হানি আপা। পেছনে টুক টুক করে হাঁটছে বাচ্চাটা। ভাইয়ার টিনি এডিশন।

খুব হালকা রঙের নীল শাড়ি পরেছে হানি আপা। চুলগুলো ছেড়ে দেয়া। ব্লাউজের বেশির ভাগই দেখতে পাচ্ছি। উঁচু ফর্সা বুক। বুকের গভীর ভাঁজটা যেখানে শুরু হয়েছে, তারও ইঞ্চি দু'য়েক নিচ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। বিয়ের পর আরো সুন্দর হয়ে গেছে হানি আপা। মেয়েরা বিয়ের পরপরই সবাই সুন্দর হয়। আমার রক্ত গরম হতে শুরু করলো। কিন্তু জিনিসটা ভাইয়ার। আমার

জন্য নিষিদ্ধ।

'কি খবর সিমুল?'

'ভালো। ভাইয়া আছে, যাও।'

'কে আছে?'

'ভাইয়া—রকিব ভাইয়া।'

'তুই কি করে বুঝলি আমি রকিবের কাছে যাচ্ছি?'

'তুমি তো আর কারো কাছে যাওনা, ভাইয়া বাদে।'

'হু। তুই তো হঠাৎ খুব লম্বা হয়ে গেছিস দেখছি।' আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে থাকে হানি আপা।

আমি বাচ্চাটাকে আদর করে কোলে তুলে নেই। ঠিক ভাইয়ার মতো হয়েছে ছেলেটা। কাকের বাসায় কোকিলের ছাঁ। আজকে হয়তো ভাইয়ার বেড রুমে একটা ম্যাচ হবে। রেসলিং। আর এই বাচ্চাটা থাকবে রেফারী হিসেবে।

'তোকে রিনি যেতে বলেছিলো।' বললো হানি আপা।

চমকে উঠলাম আমি। 'ক্যানো?'

'কি জানি, বোধহয় নোট টোট চাইবে। তুই সেকেণ্ড ইয়ারে না?'

'হ্যাঁ।'

'কোন্ সাবজেক্ট?'

'সায়েন্স।'

'তাহলে ঠিকই আছে। নোটের জন্যেই।'

'কখন যেতে বলেছে?'

'"কখন" লাগে নাকি? যখন সময় পাবি, যাবি।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার সময় একবার পেছনে তাকালাম। হানি আপার পেছনের দিকটা দারুন। আমারও লোভ হয়। কিন্তু জিনিসটা বুকড্। আমার দেখে কোনো লাভ নেই।

তবু যাই হোক, আজ ভাইয়ার শুভ দিন। একটা চমৎকার রেসলিং হবে আমাদের বাড়িতে। রফিক ভাইয়া বনাম হানি আপা। রেফারী : ভাইয়ার প্রথম প্রেমের প্রথম স্বাক্ষী।

পাঁচ

ডাবলুর বাসায় গেলাম। কোথায় গ্যাছে বলতে পারেন না ওর মা। তারেককে খুঁজতে বেরুলাম, ওকেও পেলাম না। কামাল পুর্বরাজা বাজারে গ্যাছে।

গার্ডেন রোড টু তেজতরী বাজারের শর্ট-কাট ওয়ে ধরে নবারুন ওয়েল মিলের সম্মুখ দিয়ে হেঁটে এলাম। কোথায় যাবো ভেবে পাচ্ছি না। বিকেলটাই নষ্ট। সব শালারা লাপাত্তা।

সনির কথা মনে পড়তেই ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। ছাদে উঠলে ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ প্রেম-প্রেম খেলা যেতো। মেয়েটা খুব সুইট। ইনোসেন্ট। ওর সঙ্গে দুষ্টুমি করতে দারুণ মজা লাগে আমার।

ঘড়ি দেখলাম, সন্ধ্যা ছ'টা। এখন যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে খুব একা হয়ে গেলেই সনির কথা কথা বেশি করে মনে পড়তে থাকে। ওর চেহারাটা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু চিড়িয়াটা খুব চঞ্চল। কাছে আসতে চায় না।

আমার চিড়িয়া। ইনোসেন্ট লুকিং চিড়িয়া। আমি ওকে ভালোবাসি। ওর চোখ ভালোবাসি। ওর নাক ভালোবাসি, ওর

চুল, কান, চোখের ভ্রু, ঠোঁট, চিবুক, গলা, ঘাড়, হাত, পা, বুক, বুকের উঁচু পাহাড়—সব ভালোবাসি।

কখন যে ভাবতে ভাবতে আল-রাজী হোটেলের সামনে চলে এসেছি, টের পাইনি। সন্ধ্যা হয়ে গ্যাছে। ঢুকে পড়লাম হোটেলে। ফাঁকা একটা টেবিল খুঁজছিলাম, এ সময় দেখি ঢুলুঢুলু দৃষ্টিতে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাবলু আর কামাল। একটা টেবিল দখল করে পাশাপাশি চেয়ারে বসে আছে ওরা।

'ওই শালা, তোদের খুঁজতে খুঁজতে আমার জান শেষ। আর তোরা এখানে বসে বসে মূকাভিনয় করছিস?'

'একটা সিগারেট দে তো, সিমুল।' বললো কামাল।

প্যাকেটটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা চেয়ার দখল করে বসলাম। আমার চোখ থেকে দৃষ্টি সরালো না ডাবলু। বললো, 'ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার কি—মানে?'

'একদম ইনটেক্ট এক প্যাকেট সিগারেট তোর কাছে।'

'মা'কে দিয়ে বাবার স্টক থেকে মেরে দিয়েছি। বাবার পেছনে স্পাই লাগিয়ে দিলাম। সিক্রেট আর সিগরেট সব বের করে নিয়ে আসবো।'

হা-হা করে হাসতে থাকলো ডাবলু। কামালও যোগ দিলো। আমি তিন কাপ চা'র অর্ডার দিলাম। ডাবলু হাসতে হাসতে বললো, 'খালাম্মুকে পটালি কি করে?'

'ধুৎ! কোনো ব্যাপারই না। মা'র কোলে গিয়ে ছোট্ট বাচ্চার

মতো শুয়ে পড়েছিলাম। ব্যাস, এতেই মা'র মনটা একদম গলে গ্যালো। আমার মা খুব সহজ। আমি ছোটো ছেলে তো, যা কিছুই করি না ক্যানো—সব মাফ।'

চা খাওয়া শেষ হলে কামাল উঠে দাঁড়ালো। তারপর হঠাৎ আমার কানের কাছে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বললো, 'চরস খাবি?'

'আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। দশ পিস ছিলো। আমি আর ডাবলা অলরেডি তিনটা ছাঁই করে ফেলেছি।'

'এ জন্যেই কি চোখ লাল হয়ে আছে তোদের?'

'হ্যাঁ।'

'খেয়েছিলি কোথায়?'

'ছাদে—ওয়াসা বিল্ডিঙের ছাদে।'

'তাহলে চল না, কোনো দিন খাইনি আমি। আজকেই ।'

'ই-শ্-শ্…।' ঠোঁটে আঙুল তুললো ডাবলু। ওর দৃষ্টিটা হোটেলের দরোজার দিকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম পেছনে। সোহেল আর টুম্পা ঢুকছে হোটেলে। মদ খেয়ে এসেছে দু'জনেই। টলছে। হাঁটতে গিয়ে আশ-পাশের লোকগুলোর গায়ের ওপর হেলেদুলে পড়ছে।

ডাবলুর ছোট ভাই টুম্পা। বয়স ডাবলুর দু'বছরের ছোটো। খুব ভালো ছাত্র ছিলো ও। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে ঢাকা কলেজে। কিন্তু ইদানিং কি যে হয়েছে, সারাদিন অ্যালকোহল খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে।

ডাবলুর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা শুধু বন্ধু-বান্ধবের মতো। দু'জনে দু'জনকে তুই সম্বোধন করে। ওর মদ খাওয়াটা অবশ্য ডাবলু মেনে নিতে পারে না। ডাবলুর যুক্তি হচ্ছে, আমি খারাপ হয়ে গেছি কিন্তু তুই খারাপ হবি ক্যানো? তুই পড়ালেখা করছিস পড়া-লেখা কর। কিন্তু বারণ শোনে না টুম্পা। আজকাল ডাবলুর সঙ্গ ছেড়ে সোহেলকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় যেখানে-সেখানে। মারা-মারি করে আর হরদম ড্রিঙ্ক করে।

সোহেল আমাদের গ্রুপেই চলতো আগে। কিন্তু টুম্পার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল সবচে' ঘনিষ্ঠ। টুম্পা গ্রুপ থেকে সরে পড়ার পর থেকে সোহেলও ওর সঙ্গেই চলাফেরা শুরু করলো।

টেবিলের ফাঁক দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে এসেছিলো টুম্পা। আমাকে দেখে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে থাকলো। ওর পেছনে সোহেল।

'সিমুল, তুহ ইদার কেয়া করতা হ্যায়?'

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ডাবলু বললো, 'কামাল, টুম্পাকে এখান থেকে ভাগা।'

'সিমুল, তুমারা ফ্রেণ্ড কাঁহা গিয়া?' টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো টুম্পা। 'ডার্লিও···এক্স···ওয়াই···ডেড।'

'টুম্পা, তুই যাতো এখন। ওই সোহেল, ওকে নিয়ে যাতো এখান থেকে।'

'চলে যাবো, ডোন্ট। টুমি···টুমি ভাগিয়ে দিতে চাও আমা-দেরকে?' বলতে বলতে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়লো।

সোহেল। ওর সঙ্গে ঠিক ডাবলুর মুখোমুখি বসে পড়লো টুম্পা।

'সিমুল, একটা বেনসন দে না দোস্ত।' টেবিলে হাত দু'টো বিছিয়ে দিলো টুম্পা।

'বেনসন নেই,' বললাম আমি। 'নকল ফাইভ আছে।'

'দে। আমার ব্রাদার কাঁহা গিয়া?'

আমি চোখ টিপলাম টুম্পাকে লক্ষ্য করে। ডাবলু এখনও মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে অন্য দিকে।

'তুম আঁখ মারতা কিউ, মাই ফ্রেণ্ড?'

'টুম্পা, তুই যাতো এখান থেকে?'

চোখ দু'টো সরু করে আমার দিকে তাকালো টুম্পা। 'ক্যানো?'

'ডাবলু আছে এখানে।'

'ডাবলু। সো হোয়াট? আই ডোন্ট কেয়ার।' সিগারেট ঠোঁটে চেপে আমার দিকে মুখ এগিয়ে আনলো টুম্পা। 'লিট ইট, ফ্রেণ্ড।'

সিগারেট জ্বালিয়ে দিলাম। একগাল ধোঁয়া ভুস্ করে ডাবলুর মুখের দিকে ছুঁড়ে দিলো টুম্পা। 'ইয়ে কোন হ্যায়, কামাল?'

ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে টুম্পার চোখের দিকে তাকালো ডাবলু। চোখ জোড়া কুঁচকে গ্যালো টুম্পার। এ্যাতোক্ষণে ডাবলুকে চিনতে পেরেছে ও। ঠোঁট থেকে সিগারেটটা খসে পড়লো ওর।

'ডাবলু।'

'টুম্পা, বাসায় যা।'

'ডাবলু, ভাই আমাকে মাফ করে দে। আমি দেখিনি তোকে।'

কাঁদো কাঁদো চেহারা করলো টুম্পা।

'বাসায় যা।' শান্ত স্বরে বললো ডাবলু।

'না, ডাবলু আমি বাসায় যাবো না।' হাত জোড় করে বললো টুম্পা।

আরেকটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো ও। চেয়ার থেকে নেমে টেবিলের নিচে ঢুকে পড়ে ডাবলুর পা জোড়া জড়িয়ে ধরলো। 'মুজে মাফ কার দো, ভাইয়া।' হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলো টুম্পা।

বিরক্ত হয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ডাবলু। 'সিমুল, চল।'

পা জোড়া টুম্পার হাত থেকে ছাড়াতে পারলো না ও। টানাটানি করলো কিন্তু টুম্পা ছাড়লো না।

আমি হাসবো, না কাঁদবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ডাবলুর অবস্থা দেখে বললাম। 'বল না, মাফ করে দিলাম।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মাফ করে দিলাম, যা।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ব্রাদার, থ্যাঙ্ক ইউ।' টেবিলের নিচ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললো টুম্পা। সোজা হয়ে দাঁড়ালো ও। হাসছে। চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে সেই সঙ্গে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে ডাবলু বললো, 'চল, অন্নপূর্ণা রেস্ট হাউসের ছাদে গিয়ে বসবো।'

মেহাল ইণ্ডাস্ট্রি'র পাশে ছোট্ট একটা বিল্ডিঙ। এখনও কন্‌স্ট্রাক-শানের কাজ শেষ হয়নি। বন্যার সময় অনেকে এই বিল্ডিংটার ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলো। এখন মাঝে মধ্যে আমরা বসি।

এরিনমোর টোবাকোর একটা কৌটা পকেট থেকে বের করলো কামাল। ভেতরে ছোটো ছোটো কয়েকটা কলজের টুকরার মতো জিনিস দেখতে পেলাম। একটা টুকরো দু'আঙুলে তুলে নিলো ও। ম্যাচের কাঠির মাথায় জিনিসটা গেঁথে আগুনে সেঁকে নিয়ে এরিন মোরের টোবাকের সঙ্গে মিশিয়ে নিলো। ডাবলুর পকেটে একটা পাইপ ছিলো, ওটায় টোবাকোগুলো ভরে আগুন জ্বালানো হলো। দুটো টান দিয়ে পাইপটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলো ডাবলু। ভয়ে ভয়ে দু'তিন বার পাফ করলাম। কিছুই বুঝতে পারলাম না। পাইপটা কামালকে দিলাম। কামাল দু'বার পাফ করে ডাবলুকে দিলো। আমি হঠাৎ হেসে ফেললাম। হুক্কা টানার আসরের মতো প্রত্যেকের হাতে হাতে ঘুরছে পাইপটা।

খুব মজা পাচ্ছিলাম। আমার মনটা হঠাৎ খুব হালকা হয়ে গ্যালো। মনে হলো, আমি সত্যিই খুব সুখী। মাথার ওপর চাঁদ মামা একা একা হাসছে। কী সুন্দর। আশ্চর্য, এই চাঁদটাকে আজ আমার একদম ব্রাণ্ড নিউ মনে হচ্ছে। চাঁদের আলোর দিকে কখনও লক্ষ্য করে দেখিনি। কিন্তু আজ রাতের এই অন্ধকার ছাদে, আমার মনে হলো, দুধের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আমার ক্যানো য্যানো মনে হলো, এই চাঁদের আলো মুখে লাগলে আমার সব ক'টা ব্রন ভালো হয়ে যাবে। মুখটা আরো সুন্দর হয়ে যাবে। হয়

চাঁদের মতো নয়তো সোনিয়ার মতো।

আচমকা খুক খুক করে কেশে উঠলো কামাল। গলায় ধোঁয়া আটকে গিয়েছিলো ওর। আমার খুব হাসি পেলো। আমি হা হা করে হাসতে শুরু করলাম। মাথায় ছোট্ট করে একটা চাঁটি মারলো ডাবলু। 'ধর, টান।'

পাইপটা হাতে নিলাম। ইংলিশ ফিল্মের নায়কদের মতো খুব ম্যানলি স্টাইলে পাইপটা তর্জনী দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরলাম। পাফ করে ধোঁয়া ছাড়লাম মুখের একপাশ দিয়ে। পাইপটা হস্তান্তর করলাম কামালের কাছে। ছোট করে একটা পাফ্ করলো কামাল। তারপর পাইপটা চোখের কাছে এনে দেখলো। পরমুহূর্তে উল্টে ফেলে দিলো ছাইগুলো। শেষ হয়ে গ্যাছে।

একটা ছোট্ট ভঙ্গ খেলো কামাল। বোকা বানানো গ্যাছে ওকে। অবশ্য কৃতিত্বটা কারো নয়। আমি তবু হা-হা করে হাসতে শুরু করলাম।

'পেয়ে গেছে। শালা আউট।' বললো ডাবলু।

'কি?' হাসি থেমে গ্যালো আমার।

'তোকে চরসে পেয়ে গ্যাছে।'

'অসম্ভব।'

'তা না হলে এ্যাতো হাসছিস ক্যানো?' বললো কামাল।

'হাসবো না? হাসলেই বুঝি আউট হয়ে যাবো?'

'চরস খেলে খুব হাসি পায়।' বললো ডাবলু।

আমি বোকার মত চেয়ে থাকলাম ডাবলুর দিকে। মনে পড়লো টুম্পার কথা। ইডিয়টটা মাতাল হয়ে হোটেলে কি কাণ্ডটাই না করলো। আবারও হাসতে শুরু করলাম আমি। এবার আমার সঙ্গে যোগ দিলো কামাল। সঙ্গে সঙ্গে ডাবলুও।

তিনজনে একত্রে হেসে চলেছি আমরা। আমি হাসছি টুম্পার পাগলামির সিনটা মনে পড়ায়। ওরা কে কি জন্যে হাসছে জানি না। আমার হাসিটা প্রায় শেষ হয়ে আসছিলো, এসময় ডাবলুর বত্রিশটা দাঁত এক সঙ্গে দেখে আমার হাসির মেশিনগান টপ গীয়ারে ছুটলো। হাসলে ডাবলুর চেহারাটা ঠিক ভাঁড়ের মতো হয়ে যায়। তখন ওর হাসি দেখে কেউ চুপ থাকতে পারে না।

এক সময় আমার আর হাসি আসে না। শুধু অনুভব করি গলার ভেতরে মেশিনগানের মতো অবিরাম কিছু একটা ধাক্কা খাচ্ছে। দম আঁটকে আসে আমার। বসে পড়ি দম বন্ধ করে। কিন্তু তবু হাসি থামে না। ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসি। রাস্তায় আসতেই আচমকা একটা গাড়ি ভয়াবহ শব্দে আমার পেছনে স্কিড করে থেমে যায়। চমকে উঠি। হাসতে ভুলে যাই ড্রাইভার-টা কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। তারপর স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয় গাড়ি। শুনতে না পেলেও জানি ড্রাই-ভারটা যাবার সময় শালা, বানচোত কিছু একটা বলেছে।

ছয়

বাসার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। সনিদের বাসায় যাবো নাকি একবার? আমার সনি, ইনোসেন্ট লুকিং সুইট হার্ট। খুব ইচ্ছে করছিলো ওকে একবার দেখতে। আমার বুকটা খাঁ খাঁ করতে থাকে। ঢিনি যেতে বলেছিলো। কিন্তু এই রাতের বেলা ওর বুক আর নিতম্ব দেখলে সারা রাত আর ঘুম আসবে না। ঘুমের মধ্যে বারবার ওর বুকের হিল্‌টপ দেখে দেখে তন্দ্রা ছুটে যাবে।

কলিংবেলের সুইচটা টিপে দিলাম। সেকেণ্ড দশেক পর খুলে গ্যালো দরোজা। জিনি আপা। পুরো ফ্যামিলিতে সবচে' ভদ্র আর নম্র জিনি'পা। কথা বলেন কম। খুব সিম্পলি সাজগোজ করেন। রাস্তায় বেরোলে দৃষ্টি নত করে হাঁটেন। জিনি'পাকে দেখলেই আমার ইচ্ছা করে আপা বলে জড়িয়ে ধরি। তখন আমার বোনের অভাবটা খুব প্রকট হয়ে বুকে লাগে। আমার ইচ্ছে করে জিনি'পার পা ছুঁয়ে সালাম করি।

'সিমু, এসো ভেতরে।'

'জিনি'পা ভালো আছেন?'

'ভালো। তোর আম্মু ক্যামন?'

'সবাই ভালো।'

জিনি'পার পেছন থেকে উঁকি মারছিলো সনি, দেখেই ছ্যাঁৎ করে উঠলো আমার বুক। ঠিক কবুতরের মতো লাগছে সনিকে। শাদা শার্ট আর লো-কাট স্কার্ট পরনে ওর। টানা চঞ্চল এক জোড়া চোখ অবাক হয়ে দেখছে আমাকে।

'হ্যালো সনি?'

'সিমুল ভাই?' ফিক করে হেসে ফেললো সনি। আমি ওর পরিপাটি দাঁতগুলো দেখে ফেললাম। হাসলে দাঁতগুলো অদ্ভুত ম্যাচ করে যায়। সামনের দুটো চওড়া এবং বড়।

'কি করছো?'

পেছন থেকে একটা হাত সামনে আনলো সনি। হাতে ইংরেজীর হ্যাণ্ড নোট। 'পড়ছিলাম।'

ভেতর থেকে সনির মা'র গলা শোনা গ্যালো। 'কে এসেছে, জিনি?'

'সিমুল।'

'ওকে এদিকে আসতে বল তো।'

জিনি'পা দরোজাটা বন্ধ করে ভেতরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'যাও।'

সনি আমার সঙ্গে সঙ্গে এলো। ওর কচি শরীর থেকে পারফিউমের মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসে। আমার পুরো শরীর অবশ হয়ে যায়। ইচ্ছে করে ওকে এক্ষুণি জাপটে ধরি এই বুকে। অথবা আমি ওর বুকে মিশে যাই।

বসে বসে ভিডিও ফিল্ম দেখছিলেন সনির মা। আমাকে দেখে রিমোট কন্ট্রোলের সুইচটা অফ করে দিলেন।

'সিমুল, বস্।'

আমি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। সনি ওর মা'র পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। সনির মাকে আমি সাংঘাতিক ভয় পাই। ভদ্রমহিলা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। নাটক-ফাটকে অভিনয় করেন। দেখতে খুব ইয়াং হয় তাঁকে। এই মুহূর্তে সনির চাইতেও বেশি সুন্দর লাগছে তাঁকে। আবু নামের টিভি সিরিয়াল 'বাড়ি-বাড়ি' তে ভাবীর চরিত্রে অভিনয় করেন। অভিনয়ের সময় তাঁকে টুইল ভাবীর চরিত্র পারফর্ম করতে হয়—সেখানে তাঁকে মোটেও গম্ভীর মনে হয় না।

'পথ ভুলে এসেছিস নাকি?' হেসে জিজ্ঞেস করেন কাকী। সনির মা'কে খুব ছোটোবেলা থেকেই কাকি বলে ডাকি। প্রথম প্রথম আন্টি ডাকতাম, কিন্তু "আন্টি" শব্দটা শুনলেই রেগে যান উনি। শব্দটা নাকি ফালতু গল্প বেশি ব্যবহার করা হয়। আর উচ্চারণটা ব্যামন য্যানো ড্রামাটিক। শব্দটাতে বেশী বয়সের ছাপ আছে। কাকী বললে হয়তো ইয়াং শোনায়। এ বয়সের টি, ভি আর্টিস্ট বয়স বাড়াতে নারাজ।

'পথ ভুলে আসবো ক্যানো।' আমি হেসে ফেলি।

'তুই তো একদম যাওয়া-আসা ছেড়েই দিলি, তাই বললাম।'

'না, মানে, খুব ব্যস্ত থাকি তো...'

'কিসের এ্যাতো ব্যস্ততা তোর। সারাদিন তো আড্ডা দিয়ে

কাটাস।'

আমি চুপসে যাই। কাকী সব খবর রাখেন।

'চা খাবি?'

'খাবো। প্রসঙ্গটা কাকী পরিবর্তন করে আমাকে বাঁচালেন।

'সনি, যা তো, বাদশা'র মাকে চা দিতে বল।'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালো সনি। তারপর পর্দা সরিয়ে ছুটলো কিচেনের দিকে।

'সনি'র স্কুলে নাকি গিয়েছিলি আজ?'

ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলাম। আমি সনির পেছনে ডিউটি দিচ্ছি—খবরটা ফাঁস হয়ে গ্যাছে নাকি? কে বলল? সনি নয় তো?

'গিয়েছিলাম।'

'তারপর?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন কাকী।

তারপর! তারপর কি? কি বলবো? উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবো নাকি?

'দেখলাম অনেকগুলো বাজে ছেলে ঘুরঘুর করছে ওর চার পাশে।'

'হুঁ।' গম্ভীর হয়ে যান কাকী। সনি ফিরে এসে একটা চেয়ারে বসলো।

'আমি ভাবলাম একটা কিছু করা উচিত।'

'তারপর?'

'একটা ছেলে নাকি ওর খাতা…।'

'সনি বলেছে আমাকে।'

'আমার ফ্রেণ্ড ডাবলুও ছিলো ওখানে। একটা হ্যাক স' ব্লেড ছিলো ওর হাতে, ছেলেটাকে সনি দেখিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাবলু তাড়া করলো।'

সেভেন গীয়ারের কথাটা বেমালুম চেপে গেলাম। সনি ওই জিনিসটাকে ছুরি-চাকু জাতীয় কিছু একটা বলে থাকতে পারে। আমি হ্যাক স' ব্লেড বলে কেসটাকে আমাদের ফেবারে মোলায়েম করে ঘুরিয়ে দিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করলাম সনির ঠোঁটের কোণে একটা হাসি লুকোচুরি খেলছে। তাকিয়ে আছে ঠিক আমার দিকে। তরতাজা একটা সেভেন গীয়ারকে হ্যাক স' ব্লেড বানিয়ে দেয়ায় হাসছে ও।

চিন্তিত হয়ে পড়লেন কাকী। 'ছেলে-মেয়েরা কি করে স্কুলে যাবে? আমি কি করবো? সারাদিন স্যুটিং স্পটে থাকতে হয়। ওর বাবা অফিস থেকে ফেরে বিকেলে। ওদের একটা ভাই-টাই থাকলেও এ্যাতো অসুবিধা হতো না। তুই ছেলেগুলোকে চিনিস?'

'না। তবে আমার মনে হয় আর অসুবিধা হবে না।'

'কি করে বুঝলি?'

'ডাবলুকে তেজগাঁ এলাকায় সবাই চেনে। ভয় পায়। ও যখন তাড়া করেছে, আর সাহস হবে না ওদের।'

'তবু মাঝে-মধ্যে তুই একটু দেখিস। বেশি ঝামেলা হলে স্কুল চেঞ্জ করতে হবে।'

আমি অত্যন্ত বিনীত ভংগি করলাম। করা উচিত। জানি, যে

কোনো মেয়ের সংগে প্রেম করবার আগে, মেয়ের মা-বাবার সংগে আগে করা উচিত। বিশেষ করে মা'কে পটানো গেলে মেয়ে পটানো কোনো সমস্যাই না।

নিজেকে স্লাইটলি হিরো হিরো মনে হলো। দারুণ একটা কাজ পেয়ে গেছি আজ থেকে। আমার চিড়িয়াকে আমি নিজে দেখা-শোনা করবো। নাক প্রোটেক্ট করবো সব স্ট্রীট রোমিওর কাছ থেকে। [illegible] পাওয়ার মুহূর্তে [illegible] যে [illegible] ফরাঙ করে।

চা দিয়ে গ্যালো কাজের বুয়া। তিন কাপ। সবাই নিঃশব্দে ফুঁ দিয়ে চুমুক দিচ্ছি, এ সময় কাকী বললেন, 'তোর পড়ালেখা ক্যামন চলছে?'

'ভালো। খুব ভালো।' তড়িঘড়ি করে কথা বলে ফেললাম। আসলে এ প্রসঙ্গটার পুনরাবৃত্তি হোক তা আমি মোটেই চাই না।

'তুই তেজগাঁ কলেজে না?'

'হ্যাঁ

'তাহলে তো কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। তোর ক্লাশ শেষ হয় ক'টায়?'

'দু'টা বাজে

'সনির ছুটি হয় আড়াইটায়। তুই একটু লেট করে ওকে নিয়ে আসবি ডেইলি।'

'আচ্ছা।'

আমি বেশ অবাক হয়ে যাই। এই মাত্র মারাত্মক একটা ভুল

করে ফেললেন কাকী। ডাকাতের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে টাকার বস্তা। আমি হচ্ছি ডাকাত। স্বৈরাচারী প্রেমিক। সনির হৃদয়ের ওপর আগ্রাসন চালাবো ওই সময়টাতেই—যখন সনি আমি স্কুল থেকে একসাথে ফিরবো।

সনির মাকে সাংঘাতিক ভয় পাই। মহিলা মাঝে-মধ্যে এখনও হাজবেণ্ডকে মগজ ধোলাই করেন। সে সব মুহূর্তগুলো দেখেছি। এ্যাজন পুরুষ স্পার্ক একজন নারী কতটুকু বিশেষজ্ঞ পারে তখন জানা যায়

কাকী বলেন 'দ্যাখো, রিসাত, তোমার মাথায় কটা চুল পেকেছে সংখ্যাটাও জানি আমি।'

রিসাত হচ্ছেন সনির বাবা। আর কাকী'র এই কথাটা একটা কোড,—যার অর্থ "অফিসের লেডি ক্যাশিয়ারের সংগে কোমল সুরের আলাপটা কমাও।" আমি সব জানি। পাশের বাসা তো, জন্মের পর থেকে দেখে আসছি। কথার সুর শুনলেই বুঝে ফেলি আজকের দাম্পত্য আবহাওয়া। সনিদের বাড়িতে সকাল বেলা সুর-সাধনা করার সময় হারমনিয়াম না বাজলে ধরে নিতে হবে আগের দিন রাতে কাকা বনাম কাকী'র সিডিউলের ঝগড়াটা অমিমাংসিত ভাবে ড্র হয়েছে। দুপুরে যেদিন ওদের কুকুরটা দুইটা থেকে চারটা পর্যন্ত একটানা ঘেউ ঘেউ করবে কিন্তু খাবার পাবে না, ধরে নিতে হবে সেদিন সকালে নাস্তার টেবিলে ড্র খেল ইব্রেক হয়েছে। যেদিন সনি ছাদে এসে এককোণে করে বসে থাকবে, আমি বহুভাবে ওর মুখে কথা ফোটাতে ট্রাই করবো, কিন্তু ও কথা বলবে

না, ধরে নিতে হবে সনি সেদিন স্কুলে যায়নি, তাই ওর মেজো আপা অথবা ওর আম্মু ওকে খুব বকেছে।

'সিমুল ভাই?'

চমকে উঠলাম। এ্যাতোক্ষণ চুপচাপ ভাবছিলাম। সনির ডাকে চোখ তুলে তাকালাম।

'তোমাকে রিনি'পা ডাকছে।'

উঠে দাঁড়ালাম। এগোলাম রিনির রিডিং রুমের দিকে। ছোট্ট একটা রুম রিনির। একা থাকে। একপাশে খাট, পাশে টেবিল আর চেয়ার। আলনা আর সেলফ পাশাপাশি রাখা। নিজের রুমে সাধারণতঃ অন্য কাউকে ঢুকতে দেয় না ও। এই নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হয় সনির সঙ্গে। বিনা নোটিসে ঢুকে পড়ে সনি। আই ব্রু পেন্সিল আর হেয়ার স্টাইলারটা প্রায়ই নাকি গায়েব হয়ে যায়। সময় মত খুঁজে পায় না রিনি। পরে সনির রুমে পাওয়া যায় সেগুলো। তাই রিনির রুমে সনির প্রবেশ নিষেধ। সনির চরিত্রটাই আসলে রেস্টলেস। চড়ুই পাখীর মতো। আচরণটা ভালোই লাগে আমার।

আমার আগে আগে এগোচ্ছিলো সনি। ডাইনিং স্পেস পেরোনোর সময় থেমে দাঁড়ালো ও। 'যান রিনি'পা ভেতরে।'

আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। আশেপাশে কেউ নেই। নিচু স্বরে বললাম, 'তোমার রুমে আসবো?'

'ক্যানো?' চোখ তুলে চাইলো সনি। কিছুটা অবাক দেখাচ্ছে ওকে।

'এ্যামনিই। তোমাকে আমি ভালোবাসি, তুমি আমার সুইট হার্ট তাই বললাম।'

'ধ্যাৎ!' সনির কচিমুখে বিরক্তির আভাস।

'সনি, বিলিভ মি, আই লাভ ইউ ভেরি মাচ!' ফিসফিস করে বললাম।

সনির হাতে একটা ফাউন্টেন পেন ছিলো। ক্যাপটা খুলেই আমার বুকের কাছে শার্টে কালি ছিটিয়ে দিলো। আমি অবাক। চোখের সামনে শাদা শার্টটা কদাকার হয়ে গ্যালো। পা বাড়ালাম ওর দিকে। পিছিয়ে গ্যালো ও। আবার একটা ঝাঁকুনি দিলো কলমে। এবার আমার মুখেও পড়লো কালি।

বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। হেসে ফেললো সনি। 'এবার হয়েছে?'

'ইউ আর মাই সুইট হার্ট।' আমিও হাসলাম।

'আবার!' তীব্র দৃষ্টি হানলো সনি।

'ইউ আর মাই সুইট হার্ট।' হেসে রিপিট করলাম।

'ইশ্!'

'ইউ আর মাই সুইট হার্ট।'

'ভালো হবে না কিন্তু।'

'ইউ আর মাই সুইট হার্ট'

'আই হেট ইউ।'

'বাট আই লাভ ইউ।'

'ইট ইজ টু মাচ।'

'আই লাভ ইউ সো মাচ মাই সুইট হার্ট।'

কলম ঝাঁকি দিলো সনি। কালি শেষ।

আমি আবারও বললাম, 'আই লাভ ইউ মাই সুইট হার্ট।'

দু'হাতে কান চেপে ধরলো সনি।

'আই এডোর ইউ।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের রুমের দিকে ছুটলো সনি। দরোজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরলো ও। আ করে ঠাঁট নাড়লাম দরোজাটা ধপাস করে ওর বন্ধ করে দিলো সনি।

হেসে ঘুরে দাঁড়ালাম। রিনির রুমের দিকে এগোলাম। দরোজার সামনে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে খুলে গ্যালো দরোজা। রিনি দাঁড়িয়ে।

'এ্যাতো দেরী করলে ক্যানো?'

'কথা বলছিলাম কাকীর সঙ্গে।'

'এসো ভেতরে।'

ঢুকলাম। শরীরটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। একা আমি, আর আমার সামনে একটা হট কেক্। রিনির দিকে তাকালাম। ওর চোখজোড়া ক্যামন স্বপ্নাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। ঠোঁটে হালকা লিপ্‌স্টিক মাখা। কার জন্যে এ্যাতো সুন্দর করে সাজো ললনা?— মনে মনে জিজ্ঞেস করি। ওর ঠোঁট থেকে লিপ্‌স্টিক চুষে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। চুলগুলো ছেড়ে দেয়া ওর। সিলিংফ্যানের বাতাসে উড়ছে একটু একটু। বুকটা বেশ উন্নত। ওড়না বিহীন।

চেয়ারটা টেনে দিলো ও। 'বসো। হানি'পা তোমাকে বলেছিলো, না ?'

'হ্যাঁ। কি ব্যাপার ?'

আমার ঠিক মুখোমুখি খাটের ওপর বসলো রিনি। 'বলছি ; একটু বসো।'

আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ধরালাম। টেবিলের ওপর রেখেছিলাম প্যাকেট, রিনি তুলে নিলো হাতে। খুললো। হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'খাবো একটা ?'

'তুমি স্মোক কর ?'

'নাহ্। তবে মাঝে মধ্যে দুষ্টুমি করে খাই।' একটা সিগারেট ঠোঁটে চাপলো ও।

গ্যাস লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিলাম। পায়ের ওপর পা তুলে খুব কায়দা করে সিগারেটে পাফ করলো রিনি।

'গুড।' হেসে বললাম।

'আমার ক'টা বান্ধবী আছে, ওরা খুব খায়।'

আমি চুপচাপ ওর শরীরের জিওগ্রাফী মুখস্ত করতে থাকি। প্রত্যেক পাঁচ সেকেণ্ডে একবার করে আমার চোখ জোড়া ওর বুকের ওপর থেকে ঘুরে আসে। মাঝে মাঝে দৃষ্টিটা চট করে নেমে যায় নিচে। রিনির ভাঁজ করা দু'উরুর জয়েন্ট এরিয়ায়।

আমার মাথার তালু দপদপ করতে থাকে। রক্তের কণায় কণায় উত্তাপ বাড়তে থাকে। এই মুহূর্তে আমার পালিয়ে যাওয়া উচিত। নইলে মাথায় রক্ত উঠে গেলে আমাকে কেউ থামাতে পারবে না।

কিন্তু আমি পালাতে পারি না। রিনি কিছু একটা বলবে আমাকে।

'কি বলবে, বলো।' গলা কেঁপে যায় আমার।

রিম-ঝিম করে হাসে রিনি। রহস্যময় হয়ে ওঠে ওর চোখের দৃষ্টি। 'আহ্ এত তাড়া দিচ্ছো ক্যানো। আস্তে ধীরে বলবো।'

একটা বালিশ টেনে হেলান দেয় রিনি। ওর বুকটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমার মনে হলো রিনি চায় আমি ওর বুকের জিওগ্রাফীটা ভালো করে দেখি। আমার মাথা খারাপ করতে চায় ম্যানো মেয়েটা। আমি যথাসম্ভব একটা কাম্ মুড ধরে বসে থাকি। সহজ ভঙ্গিতে পাফ করি সিগারেটে।

একগাল ধোঁয়া মুখে নিয়ে ভুস করে আমার মুখের দিকে ছুঁড়ে মারে রিনি। হাসে মিটিমিটি করে আমি ধোঁয়া থেকে চোখ বাঁচাতে কাত হয়ে যাই।

রিনি হেসে বলে, 'তোমাকে খুব ম্যানলি লাগছে।'

'তোমার ভালো লাগে?' ফস্ করে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যায় কথাটা।

'হ্যাঁ।' সোজা হয়ে বসে রিনি। আমার হু'হাঁটুর ওপর হু'হাত কাত করে বলে, 'তুমি খুব স্মার্ট।'

'তুমিও।'

'সত্যি করে বলছো?'

'হ্যাঁ। তোমাকে খুব সেক্সি মনে হয় আমার।'

আমি ভেবেছিলাম কথাটা শুনে চমকে উঠবে রিনি। রেগে যাবে। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না। আমাকে খুব কাছ থেকে

দেখতে লাগলো ও। ওর চোখ জোড়া চকচক করে উঠলো।

'খারাপ সেন্সে বলিনি কিন্তু,' বললাম আমি।

'দ্যাট'স অল রাইট!' হেসে জবাব দিলো রিনি। আরেকটু সামনে ঝুঁকে এলো ও। এবার ওর বুকের পাহাড়ের মসৃণ পাদদেশ দেখতে পাচ্ছি। আমি এক্ষুণি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখবো নাকি ও দুটো?

নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম। হোক রিনি আমার সমবয়সী ফ্রেণ্ড। কিন্তু ওর ছোটো বোনকে ভালোবাসি আমি।

এই দর্শন নীতিতে অটল থাকাটা ক্রমে কঠিন হয়ে উঠলো আমার জন্যে। আমার দু'পায়ের ফাঁকে রিনির একটা পা অনায়াসে ঢুকে পড়েছে। কোমল উষ্ণ নারী দেহের অস্থিস্থ অনুভব করছি। রিনির মুখটা এখন আমার খুব কাছে। ইচ্ছে করলেই ওর ঠোঁটে ছুঁয়ে দিতে পারি নিজ ঠোঁট। অথবা ওকে আলতো করে পেছনে চিত করে শুইয়ে দিয়ে চাপিয়ে দিতে পারি নিজের শরীরটা ওর নরম শরীরটার ওপর।

আমার হাতের সিগারেটটা নিভে গেছে আগেই। ফেলে দিলাম। বুকটা ধড়াস ধড়াস করে ব্লাড পাম্প করছে

'টেক ইট ইজ রিনির নিঃশ্বাস পড়লো আমার মুখে। কি বোঝাতে চাইছে ও? ও কি FANTA গ্রুপের মেম্বার নাকি? ওর কি "ফাক এণ্ড নট টাচ এগেন"—নীতিতে বিশ্বাস করে নাকি?

আমার মাথার ভেতর জৈবিক আকাঙ্খাটা সব বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে বিস্ফোরিত হলো য্যানো। নিজেকে ধরে রাখতে

পারলাম না আর। আস্তে করে একটা হাতে রিনির ঘাড় পেঁচিয়ে ধরলাম। কাছে টেনে আনতে চোখ বুঁজলো রিনি। আমি ওর নরম ঠোঁট জোড়া নিজ কঠিন ঠোঁটে চেপে ধরলাম। কোমল, ভেজা উত্তাপ ওর পিচ্ছিল ঠোঁটে। রিনির উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আছড়ে পড়ছে আমার চোখে-মুখে। শরীরটা শিথিল করে আমার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিলো রিনি। আমি অন্য হাতে ওর কোমর পেঁচিয়ে নিজের কোলের দিকে টেনে আনি। বাধা দ্যায় না রিনি। আমি ওর ঠোঁট চুষতে থাকি আর রিনি চুপচাপ চোখ বুঁজে থাকে।

রিনির শরীরটা খুব ভারী মনে হয়। এভাবে বেশিক্ষণ ওকে ধরে রাখতে পারবো না। আস্তে করে ওকে বুকে নিয়ে খাটের ওপর বসিয়ে দিলাম। তারপর ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলাম। ওর বুকের ওপর বুক চাপিয়ে দিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালাম।

রিনি সাগ্রহে সাড়া দিচ্ছে। আমি এক ধাপ বাড়লে, সে দু'ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার গলা পেঁচিয়ে ধরলো ও, দু'হাতে আমার বুকের নিচে ওর নরম বুক থেঁৎলে যেতে থাকে।

আমি এখনও অবাক হতে থাকি। রিনি যে এ্যাতোটা এগ্রেসিভ, জানতাম না। ও যে ইতিমধ্যে পাকা খেলোয়াড় হয়ে উঠেছে, জানলে এ্যাতো দিনে আমি ওর নিয়মিত পার্টনার হয়ে উঠতাম।

আমার চুম্বক ঠোঁট থেকে নিজের ঠোঁট রবারের মতো টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে আচমকা আমার কাঁধে, গালে কামড় বসিয়ে দিতে লাগলো রিনি। আমি খুব ধীরে সুস্থে ওর পিঠের নিচে হাত ঢুকিয়ে টিস্-টিস্ করে বোতামগুলো খুলে ফেলতে লাগলাম।

খাটের উপর পা মেলে বসলাম। রিনির কোমর ধরে আকর্ষণ করতেই বুকে ধরা দিয়ে কাঁধে মুখ গুঁজলো। আমি আনাড়ি স্টাইলে ওর কামিজটা খসিয়ে দিলাম। কালো রঙের ব্রা'টা দৃষ্টি কেড়ে নিলো। স্টাইপ খুলে দিতেই ওর বুকের একজোড়া নরম শালগম দুলে উঠলো। ফর্সা টকটকে ওদু'টোর ওপর কালো ব্রা' লেপ্টে রয়েছে। অপূর্ব।

আবার শুইয়ে দিলাম ওকে। বুকে বুক চাপিয়ে দিলাম আগের মতো। পর মুহূর্তে মুখটা এগিয়ে নিলাম নরম পাহাড়ের দিকে। খুব আলতো করে চুমু খেলাম নরম এলাকার কালো শীর্ষে। শিউরে উঠলো রিনি। আমি ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো মুখে ভরে নিলাম একটা। বাঁ হাতে ধরলাম অন্যটা।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। রিনি আমার পেন্টের বেল্ট ধরে টান দিয়েছে আমি বিস্ময় কাটিয়ে ওঠবার আগেই দেখলাম সুড়সুড় করে ওর একটা হাত ঢুকে যাচ্ছে আমার নিষিদ্ধ এলাকায়।

আমার পৌরুষ মুঠ করে ধরে ফেললো রিনি। আদর করছে। আর রাগে ক্ষোভে ফুঁসে উঠছে আমার পৌরুষ।

পাগল হয়ে গেলাম আমি। রিনির নাভির কাছে ডান হাত দিয়ে একটা ফিতা খুঁজে পেলাম। টান দিতেই ফস্ করে ঢিলে হয়ে গেলো। ত্রস্ত হাতে হাঁটুর দিকে নামিয়ে দিলাম সালোয়ার।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছি রিনির নিষিদ্ধ এলাকার দিকে। ত্রিভুজ আকৃতির ছোট একটা এলাকা। অল্প অল্প গাছপালা গজিয়েছে ওখানে। নিচে ছোট্ট একটা মসৃণ ···। একটা রহস্যময়

ঝর্ণা। ঝিকমিক করছে স্বচ্ছ পানি।

ফাঁ করে চেইন খোলার শব্দ হলো। তারপর ফট করে একটা শব্দ হতে অনুভব করলাম আমার পেন্ট লুজ হয়ে গ্যাছে। রিনি ঠেলে হাঁটুর দিকে সরিয়ে দিলো ভারী জিনসের পেন্টটা। আরেকটা টানে আমার সেকেণ্ড স্কুথটা নিচে নামিয়ে দিলো ও। তারপর শক্ত মুঠোয় ধরলো আমার পৌরুষ।

এখন আমার শরীরে টগবগ করে রক্ত ফুটছে। মাথার ভেতর দপদপ করছে একটা শীরা। আমি নরম নারী দেহের কোমল (?) উত্তাপে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো জ্বলজ্বল করছি য্যানো।

নগ্ন বুকে চেপে ধরলাম নগ্ন কোমল শরীর। রিনির ঠোঁটের কাছে মুখ এগিয়ে নিলাম আবার। চোখে চোখে তাকালাম ওর। ঘামে সপ্-সপ্ করছে রিনির মুখ। দু'জনেই দরদর করে ঘামছি।

রিনির মুখের দিকে তাকাতেই মুহূর্তের জন্যে সনির সঙ্গে ওর চেহারার মিলটা দেখতে পেলাম। রিনির চেহারাটা মুহূর্তের মধ্যে সনির চেহারা হয়ে গ্যালো। আমার মনে পড়লো আমি সনিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। ওকে তো আমার বিয়ে করার ইচ্ছা। যাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো, তার বড়টির সঙ্গে আমি কি করছি এখানে, এখন, এই মুহূর্তে ?

আমার উত্তপ্ত শরীরে কেউ য্যানো ফ্রীজের ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিলো। আমার শরীরটা হঠাৎ অবশ হয়ে গ্যালো। আমি ক্লান্ত হয়ে রিনির কাঁধে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম।

রিনি তখনও আমার পৌরুষ নিয়ে খেলছে। আমার পৌরুষ

নিয়ে ওর নারীত্বের গায়ে ঘষছে। উত্তেজিত রাখতে চেষ্টা করছে আমাকে।

আমি যন্ত্রণা কাতর স্বরে ডাকলাম। 'রিনি, রিনি।'

'কি?' ফিসফিসে মাদকতার স্বরে জবাব দিলো ও।

'তুমি কি য্যানো বলবে···।'

'চুপ। এখন না।'

'প্লিজ—প্লিজ।'

'পরে। এখন শুরু করো তো!'

'আগে বলো, প্লিজ।'

আমার কাঁধে তীব্র একটা কামড় বসিয়ে দিলো রিনি। আমি 'উফ' করে উঠলাম। কিন্তু রিনি পাত্তা দিলো না আমার পৌরুষটা তখনও ওর মুঠোর মধ্যে নিষ্পেষিত হচ্ছে। আমি দম বন্ধ করে থাকলাম। কিন্তু সহ্য করতে পারছিলাম না।

রিনি আমাকে জোর করে টেনে নিলো ওর বুকে।

'আমি কাতর স্বরে বললাম। 'আজ আর নয়, রিনি, প্লিজ।'

'ইশ্-শ্-শ চুপ।'

'পরে···পরে, রিনি প্লিজ···।'

'আহ। তুমি যে কি!'

'কি বলবে, বলো না?'

'পরে কবে আসবে, কখন?' জিজ্ঞেস করলো রিনি।

'যখন বলবে তুমি।'

'এখন অসুবিধাটা কি?'

'আছে। তুমি বুঝবে না।'

'ক্যানো?'

'অসুখ-অসুখ, আমার একটা অসুখ আছে···ওষুধ খাচ্ছি।'

'কি অসুখ।'

'সিফি···সিফিলিস্।' মিথ্যা বলতে শুরু করলাম।

'ওহ্-হেয়। ঠিক আছে···।'

'কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে···।'

'ঠিক আছে, তুমি ভালো হয়ে গেলে জানাবে আমাকে।'

'আচ্ছা।'

'আগে বললেই পারতে।'

'বুঝতে পারিনি। তুমি এ্যাতোটা ফ্রী হবে আমার কাছে, স্বপ্নেও ভাবিনি আমি।'

'আমি খুব ফ্রী। তোমাকে এক সপ্তাহ সময় দিলাম।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

খাটে উঠে বসলো রিনি। সালোয়ারটা পরলো। ওর মুখে কিছুটা বিরক্তির ছাপ। অতৃপ্তির চিহ্ন। আমি ওকে কাছে টেনে ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে আদর করে দিয়ে বললাম, 'রাগ করো না। আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।'

হাসলো রিনি। 'না-না, বলেছো, ভালোই হয়েছে।'

আমি পোশাকটা ঠিক করে চুল আঁচড়ে বেরিয়ে এলাম। আশপাশে কাউকেই দেখছি না। কাকীর রুম থেকে ফিল্মের ইংলিশ ডায়ালগ শোনা যাচ্ছে। সনির রুমটা অন্ধকার। দরোজা

খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। পরমুহূর্তেই চমকে উঠলাম সনিকে। দেখে। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও।

'সনি?'

মুখ তুলে চাইলো সনি। আমার বুকটা ধ্বসে গ্যালো। সনি টের পেয়ে যায়নি তো?

হাসলো সনি। 'চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। কি করছো তুমি?'

'এমনিই দাঁড়িয়ে আছি। কুকুরটাকে খাবার দিয়েছিলাম।'

'সনি?'

'উম্।'

'আমাকে কষ্ট দিও না, প্লিজ।'

'ক্যানো? আমি কি আপনাকে কষ্ট দেই নাকি?'

'হ্যাঁ। তুমি আমাকে ভালো না বাসলে আমি মরে যাবো।'

হেসে ফেললো সনি। 'আমি কি করবো তাহলে?'

'তুমি মাঝে মধ্যে বলবে, তুমিও ভালো বাসো আমাকে।'

'উহ্। এসব পারবো না আমি।'

'পারবে। ধীরে ধীরে সব পারবে।' সনির গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম। ওর চিকন কোমরটা আলতো করে পেঁচিয়ে ধরলাম। চমকে উঠে আমার চোখের দিকে তাকালো সনি। কি সুন্দর নিষ্পাপ চোখ সনির।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, সনি। তুমি আমার সুইট হার্ট।'

'আপনি বাসায় যান তো।'

'এই তো যাচ্ছি।'

'এ রকম করলে আপনার সঙ্গে কথা বলবো না।'

'সর্বনাশ!' আমি হাত জোড় করলাম। 'এ রকম শাস্তি দিও না, প্লিজ!'

হেসে ফেললো সনি। সিঁড়ির দিকে হাত তুলে বললো, 'তাহলে সোজা বাসায় যান। এ্যাতো রাত করে ঘুরে বেড়ান ক্যানো?'

'তুমি বললে আর ঘুরবো না।'

'আর ঘুরবেন না।' শাসনের সুরে বললো ও।

'আচ্ছা-আচ্ছা।' আমি সোজা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম

'শুনুন-শুনুন।' পেছন থেকে ডাকলো সনি।

'কি?' ঘুরে দাঁড়ালাম।

দ্রুত পা ফেলে সনি আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। 'আপনার শার্টটা নষ্ট করে দিলাম বলে রাগ করেন নি তো?'

'না, প্রিয়তমা না। তুমি এক দোয়াত কালি ঢেলে দিলেও রাগ করবো না।'

'আপনি তো দারুণ লোক। কিছু মনে করেননি?'

'না, কিছু মনে করিনি।'

কথাটা শুনে ক্যানো খুব মজা পেলো সনি। আচমকা আমার লম্বা চুল খামচে ধরে টেনে দিলো ও। 'আপনি সত্যি খুব ভালো।'

'হ্যাঁ। আমি তোমার জন্যে আমরণ ভালো থাকতে চেষ্টা করবো।'

'কিন্তু আপনার ঐ কথাটা খুব খারাপ লাগে শুনতে।'

'কোনটা?'

'আপনি খালি ভালোবাসার কথা বলেন।'

'আমি সত্যি-সত্যিই যে তোমাকে ভালোবাসি।'

'আবারও বলছেন?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, আজ আর বলবো না।'

হাসলো সনি। আমি আবার নামতে শুরু করলাম। ওপর থেকে হাত নাড়লো মিষ্টি মেয়েটা।

সাত

বাসায় ফিরলাম রাত ন'টায়। রক্তের উত্তাপ তখনও কমেনি। জ্বলে পুড়ে ছাঁই হয়ে যাচ্ছি। এ আগুন, নারীর কোমল দেহের আগুন। কোমল কিন্তু সর্বগ্রাসী। ধ্বংসের। আমার উনিশ বছরের বারুদ-শরীর। আগুন দেখে এসেছি আজ। কোমল আগুন। নিজেকে আরেকটু হলে জ্বালিয়েই দিয়েছিলাম। শরীরে তখনও সেই আগুনের ছোঁয়া। চোখে ভাসছে সেই প্রিয় আগুনের রূপ। পুড়ে যাচ্ছে আমার শরীর।

তবু আমি য্যানো আজ বেঁচে গেছি। আমি আমার প্রেমকে রক্ষা করেছি। নিজেকে নষ্ট করিনি। আমি সনির। শুধুই সনির সনি আমার। ওর জন্যে আমি ভালো থাকবো। আমার জন্যে ও ভালো থাকবে।

শার্ট খুলে হ্যাঙ্গারে চড়ালাম বেসিনে মুখ ধুতে গিয়ে আয়নায় দেখি আমার ঠোঁটে একটু একটু লিপিস্টিকের রঙ এখনও লেগে আছে। ভাগ্য ভালো সনি লক্ষ্য করেনি। করলে সবই হারাতাম লক্ষ্য করলাম আমার চোখ জোড়া লাল। চরস খাওয়াতেই সম্ভবতঃ এমন হয়েছে। নিজের কাছেই নিজেকে হঠাৎ খুব খারাপ

লাগলো। আমি আসলে একটা মুখোসধারী শয়তান। সুঁইয়ের মতো সনিদের বাসায় ঢুকে কুড়োল মার্কা কি অকাণ্ডটাই ঘটাতে বসে ছিলাম। আমার এই কলঙ্ক অভিযাত্রাকে বাধা দিয়েছে কে? আমার বিবেক? আমার ভালোবাসা? না আমি যাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি সেই সনি?

হ্যাঁ, সনি। আমার প্রেম, আমার স্বপ্ন। আমার ইনোসেন্ট প্রিয়তমা। ওর মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠাতেই থেমে গেছি। নইলে রিনির উষ্ণ ভালোবাসার স্রোতে ডুবে যেতাম আজ। মাখামাখি হয়ে যেতো দুটো নর-নারীর দেহ।

ডাইনিং রুমে মা একা বসে আছেন। ঢুকতেই চোখ তুলে তাকালেন। 'বস।'

মা'র মুখোমুখি বসলাম। মা বললেন, 'কোথায় ছিলি এ্যাতোক্ষণ?

'বাইরে

'বাইরে কোথায়?'

'সনিদের বাসায়।'

'সনি?'

'আহ্, তোমাকে নিয়ে আরেক বিপদ রিসাতকে চেনো।'

'হ্যাঁ। পাশের বাড়ির লোকটা। ব্যাংকে চাকরী করে।'

'সনি হচ্ছে রিসাত কাকার ছোটো মেয়ে। ওকে আমি বিয়ে করবো।'

'বেশ তো।'

'তুমি রাজী তাহলে।'

'মেয়েটাকে নিয়ে আসবি বাসায়। আমি দেখবো।'

'বিয়ে করার পরে দেখো।'

'কি বললি?'

'মানে, ওকে লাল কাপড়ে জড়ানো গোলাপী মুখে আর আমাকে সাদা পাগড়ী মাথায় একসাথে দেখো। আমি ওর মুখ আঙ্গুল দিয়ে তুলে তোমাকে দেখাবো। অবশ্য একথাও সত্য যে, তুমি ভেটো দিলেও ওকেই আমি বিয়ে করবো।'

মা'র খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। চোখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি হঠাৎ থতমত খেয়ে ঘাড় নিচু করি।

'সিমুল?'

'জী।'

'তাহলে তোর মায়ের পছন্দের কোনো দাম নেই, না?'

'সরি। ক্ষমা করে দিও। জ্যাস্ট তোমার সঙ্গে একটু দুষ্টুমি করলাম।' দু'হাত জোড় করলাম।

'ঠিক আছে ক্ষমা করলাম। কিন্তু এসব কি হচ্ছে?'

'কি?'

'তুই কি বিয়ে পাগলা হয়ে গেলি নাকি?'

হেসে ফেললাম। 'না, মা। এটাও ফাজলামি করে বলেছিলাম।'

'আমার মন খারাপ। ফাজলামি করবি না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে তুমি খাও।'

আর খেলেন না মা। ভরা প্লেটে পানি ঢেলে উঠে দাঁড়ালেন।

বেসিনে মুখ ধুয়ে আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে সোজা নামাজের ঘরে চলে গেলেন।

আমি চুপচাপ বসে থাকি। পেটে অসম্ভব ক্ষুধা আমার। অন্যদিন হলে, আমিও এখন না খেয়ে উঠে পড়তাম। কিন্তু আজ আমার সব কিছু গিলে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। চরস খেলে শুনেছি খুব ক্ষিদে বাড়ে। কারণটা এটাই। আমি ঘাড় নিচু করে নিঃশব্দে খেয়ে যাই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট হতে থাকে আমার। আমার কথায় না খেয়ে উঠে গ্যাছেন মা। আমি খুব ভালোবাসি মাকে মা'র রাগ কিভাবে কমাতে হয় জানি সিদ্ধান্ত নিলাম খাওয়া শেষ করেই মার কাছে যাবো।

খাওয়া শেষ করে পানি খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। টেবিলে এসময় হঠাৎ আলাউদ্দিনের ম্যাজিক ল্যাম্পের দয়ায় এক গ্লাস দুধ এসে গ্যালো। গ্লাসটা রেখেই মা বললেন, 'তোর বাবা ডাকছে।'

শক্ খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাবা আমাকে খুব একটা ডাকেন না। কোনো কাজের দরকার হলে বাবার বিশ্বস্ত সন্তান রফিক ভাই আছেন। এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে হলেও বাবা আমাকে ডাকেন না। শুধু একটা সময়ই বাবা আমাকে ডেকে পাঠান, সেটা বকুনির লগ্ন এলে। জন্মের পর থেকে বাবাকে কোনোদিন খোশ মেজাজে দেখিনি। মুখটা ভয়ঙ্কর গম্ভীর করে রাখেন দিনরাত। যেদিকে তাকান, সেদিকটা ভস্ম হয়ে যায় তাঁর চোখের ক্রোধে। বাবার সামনে গেলেই ভয়ে হাত পা কাঁপতে শুরু করে আমার। হাঁটুর তেল শুকিয়ে যায়। ইচ্ছে করে তখন কোথাও

বসে পড়তে। কিন্তু এটাও বাবার সামনে সাংঘাতিক স্পর্ধা, বিশেষ করে বকুনির পিরিয়ডে ব্যাপারটা তো ভয়াবহ।

'দাঁড়িয়ে রইলি ক্যানো? এটা শেষ কর। তারপর গিয়ে শোন কি বলে তোর বাবা।' অনেকটা ধমকের সুরে বলেন মা।

আমার গলা শুকিয়ে আসে। মা গ্লাসটা হাতে ধরিয়ে দ্যান। আমি এক নিঃশ্বাসে গ্লাসটা শূন্য করে টেবিলে নামিয়ে রাখি। তারপর তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে চিন্তিত দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকিয়ে থাকি।

'তুমিও সঙ্গে চলো না।'

চোখ কটমট করে তাকান মা। 'আমি আসছি তুই যা।'

অগত্যা এগোলাম বাবার রুমের দিকে। বাবার রুমের দরোজা পথে পর্দাটা ফ্যানের বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে। ফাঁক দিয়ে দেখলাম বাবা নিউজ উইকের চলতি সংখ্যাটা খুব গম্ভীর হয়ে পড়ছেন। ওই একটা ম্যাগাজিনই পড়েন বাবা। সব সময় হাতের কাছে রাখেন ম্যাগাজিনটা, আর যে-ই আসুক খুব কৌশলে রাজনীতির প্রসঙ্গটা তুলে বাবা তার হাতে ম্যাগাজিনটা তুলে দিয়ে হে হে করে হাসতে থাকেন। ওই বিশেষ মুহূর্তেই এই বাড়িতে বাবার হাসির শব্দ শোনা যায়। অন্য কোনো বিষয়ে বাবা সাধারণত হাসেন না। একবার বড় ভাই আমার সঙ্গে বাজি ধরলো, বাবাকে হাসাবে। খুব সাবধানে একট কৌতুক বলবে বাবার সামনে। কৌতুকটা এক শ' পার্সেন্ট হাসি প্রুফ। ভাইয়ার মতে আজ পর্যন্ত কেউ কৌতুকটা শুনে না হেসে পারেনি। যাই হোক দু'ভাই

কাজে লেগে পড়লাম। স্থান আর সময় ঠিক করা হলো।

ডাইনিং টেবিলে রাতের খাবারের সময়। সকালে বাবা কথা বলতেও পছন্দ করেন না, শুনতেও পছন্দ করেন না। দুপুরে তাঁর মেজাজ থাকে ফর্টি নাইন। রাত্রে সাধারণতঃ নর্মাল মুডে থাকেন। তখন ডিনার লিষ্টে গরুর কলজে ভাজা থাকলে তো বাবার সেদিন ফুল চার্মিং মুড। ভাইয়া সব প্ল্যান করে নিলো। সকালে কাওরান বাজারে ভেজিটেবল মার্কেটে গিয়ে ভাইয়া একটা গরুর কলজেও কিনে নিলো। আমাদের কাজের মেয়েটাকে বলা হলো যাতে শুধু ডিনারেই সার্ভ করা হয় কলজে ভাজা। সব ঠিক-ঠাক। যথারীতি খেতে বসলাম সবাই। আমি আর ভাইয়া গা টিপাটিপি করছি। বাবা কিছুটা অন্যমনস্ক। এটা নর্মাল মুডের লক্ষণ। এখনও প্রিয় খাবারের আগমন সংবাদ পাননি তিনি। ভাইয়া কখনও নিজ হাতে প্লেট নিয়ে খান না। মা সব কিছু ম্যানেজ করেন। কিন্তু ভাইয়া সেদিন নিজে প্লেট টেনে নিয়ে আচমকা কলজে ভাজির ডিসের ঢাকনাটা তুলে ফেললেন। গরম বাষ্পের সঙ্গে কলজে ভাজার খুশবু বাবার নাকে লাগতেই বাবার মুড চেঞ্জ। বাবা হেসে বললেন, 'ব্যাপার কি?'

ভাইয়া স্থান-কাল পাত্র ভুলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'জিতে গ্যাছি। না বলতেই ...।' আমি দ্রুত বাধা দিয়ে বললাম, 'শব্দ না হলে হবে না।'

'কি হলো!' বাবার বিরক্ত গলার স্বর শোনা গ্যালো।

আমি আর ভাইয়া একদম নিশ্চুপ। মা আগেই জানতেন

আমাদের প্ল্যানটা। লক্ষ্য করলাম হাসি চাপতে খুব কষ্ট হচ্ছে মা'র। 'কি যে হয়েছে চোখের,' বলে তিনি শাড়ির আঁচল চোখের কাছে তুলে হাসি ঢাকার চেষ্টা করছেন।

ব্যাপারটা খেয়াল করলেন না বাবা। চোখ থেকে চশমা খুলে পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে হাতা গুটাচ্ছেন তিনি। সর্বনাশ! আমি শিওর হেরে যাবো। সব কিছুই ভাইয়ার প্ল্যান মতো ঘটতে শুরু করেছে। হঠাৎ আমাদের দু'ভায়ের আচমকা তর্ক শুনেও বাবা মুড লস করেননি। খাওয়ার জন্য হাতা গুটাচ্ছেন। এটা মোস্ট চার্মিং মুডের লক্ষণ বাবা বললেন, 'এনজয়েবল সারপ্রাইজ। গুড, ভেরী গুড।'

ভাইয়া এরকম একটা সুযোগের জন্যেই ওঁৎ পেতে বসে রয়েছিলেন। সুযোগটা পেয়েই সুঁইয়ের মতো খুব সূক্ষ্ম স্টাইলে দু'টো ওয়ার্ড খসিয়ে দিলেন ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, 'যা দাম।'

আসলে দাম টাম কোনো ফ্যাক্টরই না। ভাইয়া জাস্ট কথাটা বলে বাবার কথার খেই ধরলো। এক সময় একটা প্রসঙ্গের ভেতর দিয়েই আচমকা কৌতুকটা সার্ভ করবে ও।

খুব কাজ হলো ভাইয়ার কথায়। বাবা মুখ তুলে বললেন, 'কত?'

'চল্লিশ টাকা।'

'তাহলে তো ঠিকই আছে।'

ভাইয়া একটু বিপদে পড়ে গ্যালো। কথাটার কি জবাব দেবে। বাবা খবর ঠিকই রাখেন, গরুর কলজের দাম আগেও চল্লিশ টাকাই

ছিলো।

কিন্তু ভাইয়া দ্রুত বললো, 'এই কলজেটা তো বড় একটার চাইতে অনেক ছোটো। দ্যাখোনি, দুপুরে সার্ভ না করে এখন দেয়া হচ্ছে

মা বললেন, 'সিমু তাড়াতাড়ি খা তো। খেয়ে আমার জন্যে দুটো ঘুমের টেবলেট নিয়ে আসবি '

আমি বেশ অবাক হলাম। ভাইয়া ঠিক এরকম একটা প্রসঙ্গই আশা করছিলো

বাবা খেতে খেতে বললেন, 'হঠাৎ আবার ঘুমের টেবলেটের দরকার পড়লো ক্যানো?'

'কি জানি, দু'তিন দিন ধরে রাতে ঠিক মত ঘুম হচ্ছে না।'

'হবে কি করে। একটু আধটু হাঁটতে হয় সবার। তুমি তো সারাদিন বসে বসে কাটাও।'

ভাইয়া এক গ্লাস পানি খেয়ে নিয়ে বললো, 'আমার এক ফ্রেণ্ডের বাবা আগে চব্বিশ ঘন্টা জেগে থাকতো। কিছুতেই ঘুম হতো না তাঁর। ভদ্র লোককে পাঁচ শ' এম জি ইউনেকটিন খাইয়েও ঘুম পাড়ানো যেতো না।'

মা খুব আগ্রহী হয়ে পড়লেন। 'তারপর?'

'এক ডাক্তার বললো—বেশি ওষুধ—ফষুধ খেয়ে লাভ নেই। শরীর উইক হয়ে যায়। একটা ছোট বুদ্ধি দিলো ডাক্তার। বললো, শুধু একটা ফাইভ এম জি স্লিপিং পিল খেয়ে সোজা বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়তে।' ভাইয়া মুখে ভাত নিয়ে চিবুতে

লাগলো।

লক্ষ্য করলাম বাবাও মনোযোগ দিয়ে শুনছেন।

'এরপর,' শুরু করলেন ভাইয়া। 'পেসেন্টকে শরীরের সব পার্টস শীথিল করে দিতে হবে। হাত পা মেলে দিয়ে বলতে হবে "হাত, তুমি ঘুমাও," "পা তুমি ঘুমাও"। এভাবে একটা একটা করে শরীরের সব অঙ্গ শীথিল করে দিয়ে কথাটা বলতে হবে। আমার ফ্রেণ্ডের বাবার খুব পছন্দ হলো বুদ্ধিটা। তিনি বাসায় এসেই খাটে শুয়ে পড়লেন। লাইট অফ করে দিয়ে তিনি শুরু করলেন কাজটা। প্রথমে হাত দু'টো শীথিল করে দিয়ে বললেন, "হাত, তুমি ঘুমাও।" তারপর পা জোড়া শীথিল করে কথাটা রিপিট করলেন। এভাবে হাত, পা, আর কোমরের পর্বটা সেরে সবে মাত্র পেটের অংশের কাজ শুরু করবেন, এ সময় তাঁর হঠাৎ মনে পড়লো পাঁচ এম জি ট্যাবলেটা ভুলে খাওয়া হয়নি। চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক 'হাত, পা কোমর—তোমরা সবাই এক্ষুনি জেগে পড় আমি টেবলেট খেতে যাব।'

মোশনগানের গুলির মতো ধা-ধা করে হাসি ছুটলো আমার চিরগম্ভীর বাবার মুখ দিয়ে। মা হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে পানি ছেড়ে দিলেন।

শুধুমাত্র আমি হাসতে পারিনি। আমার পঞ্চাশ টাকা লস্। ভাইয়া বেটে জিতে গ্যাছে। টাকাগুলো মা'র কাছে জমা ছিলো। মা হাসি থামিয়ে বাঁ হাতের মুঠ থেকে দু'টো পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে একটা নোট ভাইয়াকে দিয়ে বললেন, 'তুই জিতেছিস।'

বাবা চোখ তুলে মার দিকে তাকালেন। মা বাকি নোটটা বাবার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ধরো, কাল বিকেলে আমরা এ টাকা দিয়ে মিষ্টি খাবো।'

বাবা কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, 'হোয়াট ডি' ইউ মিন?'

'ওরা দু'জনে বেট ধরেছিলো,' হেসে বললেন মা। 'রকিব জিতেছে আর সীমু হেরে গ্যাছে।'

'কি নিয়ে বেট?' বাবা শান্ত মেজাজে জিজ্ঞেস করেন।

'তোমাকে হাসানোর ব্যাপার নিয়ে। রকিব বলেছে তোমাকে হাসাবে। সীমু বলেছে পারবে না—এ নিয়ে বাজী।'

'হোয়াট?' চোখ গরম করে তাকালেন বাবা।

'হাউ ডেয়ার ইউ, জোক অন মি।'

ভাইয়া, মা আর আমি সবাই চুপ।

বাবা বিস্ফারিত হলেন। 'তোমাদের সাহস তো কম নয়। গেট আউট—জাসট গেট আউট ফ্রম মাই সাইট।'

আমি আর ভাইয়া হাত না ধুয়েই উঠে পালালাম। ভাইয়ার রুমের দরোজা লাগিয়ে দু'জনে পেট ভরে হাসতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর মা এলেন। মা নাকে মুখে শাড়ি গুঁজতে গুঁজতে বললেন, 'তোর বাবা বেশ জব্দ হয়েছে আজ।'

যা'হোক, বাবার রুমে যেই আসুক, বাবা নিউজ উইকের কপিটা তুলে দিয়ে খুব অমায়িক ভঙ্গিতে হে হে করে হাসতে থাকেন আর বলেন, 'পড়েই দেখুন না। আমার ছেলে রফিক লিখেছে। চমৎকার পলিটিক্যাল অর্টিক্যাল লিখেছে। দেশের যা অবস্থা।

বুঝলেন, শেখ সাহেবের আমলে যখন··· । জিয়ার আমলে যখন··· ।'

এই হচ্ছে ইদানিং বাবার কাজ । বই, ম্যাগাজিন পড়েন । ড্রইং-রুমে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেন । আর সুযোগ পেলেই ভাইয়াকে চালিয়ে দেন প্রসঙ্গের ফাঁকে ।

আমি জানি, বাবা আজ খুব বকা-ঝকার মুড নিয়ে মাকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়েছেন । এ সব মুহূর্তগুলো আমি চিনি । বাবা খুব গম্ভীর থাকেন । খাটে আধ-শোয়া হয়ে মাকে দিয়ে তলব পাঠান । মা হচ্ছেন বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী । বসের সব কাজই চমৎকার করে দেন । আমি পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম । 'বাবা, আমাকে ডেকেছো ?'

বাবা খাটের ওপর উঠে বসলেন । কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে । 'আজকাল ভালো আড্ডা দিতে শিখেছো দেখছি ।'

আমি সাইলেন্ট । এখন কিছু বলা মানে বাবার মেজাজটা উস্কে দেয়া । তাতে ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা ।

'কতদিন চলবে এসব ?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম । 'একটা নোট আনতে গিয়েছিলাম, ফিরতে তাই একটু দেরী হয়ে গ্যালো ।'

'আই সি,' চোখ গরম করে তাকালেন বাবা । 'তাহলে পড়া-শোনায় তোমার যথেষ্ট মনোযোগ আছে বলতে হবে ।'

আমি ঘাড় নিচু করলাম । এখন বিস্ফোরিত হতে পারেন বাবা । লক্ষন দেখতে পাচ্ছি । কিন্তু বাবা বিস্ফোরিত হলেন না । ভয়াট গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ভালো হয়ে যাও । ভালো হতে

পয়সা লাগে না। যাও।'

বেরিয়ে এলাম। মা দাঁড়িয়ে আছেন একপাশে। চোখা-চোখি হতেই পড়ার রুমের দিকে ইঙ্গিত করলেন, 'যা, এক্ষুণি পড়তে বস।'

এগোলাম। ভাইয়ার রুমে আলো জ্বলছে। গ্যাস লাইটারে সিগারেট ধরাচ্ছেন ভাইয়া। দৃষ্টিটা আমার দিকে। দাঁড়ালাম না। ভাইয়া বোধহয় খুশীই হয়েছে বাবার ট্রিটমেণ্টে।

পড়ার রুমে ঢুকে দরোজাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর জানালা খুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। বকা-ঝকা শোনার পর সিগারেট খেলে দুঃখটা চাপা পড়ে।

আট

আজ আমার নতুন পাওয়া চাকুরীর প্রথম দিন। কলেজে বসে লেক-চার শুনছি। এক অক্ষরও আমার কানে ঢুকছে না। বার বার কব্জিতে আঁটা কালো সিকো পাঁচ ঘড়িটার দিকে চোখ যাচ্ছে। দু'টোর সময় ক্লাস শেষ হবে। তবুও যেন মনে হচ্ছে যদি আড়াইটা বেজে যায়? যদি সোনিয়া চলে যায়? ও কি আমার জন্য অপেক্ষা করবে?

দু'টো বাজলেই ঘণ্টা বাজবে। ক্লাশ শেষ হবে। চাপাবাজ মানিক স্যারের চাপা শেষ হবে। আমরা মানিক স্যারের নামের আগে ওরকম চারটে অক্ষর জোড়া লাগানো অবস্থাতেই পেয়েছি। কলেজে ঢুকতে না ঢুকতেই স্যারের উপাধিটা যোগ করে নামটা উচ্চারণ করতে সবাইকে শুনেছি। আমিও বিশেষণটা জুড়তে বাদ দেবো কেন? বিশেষণটা কবে এবং কারা জুড়েছে জানি না।

পড়ানোর সময় হৈমন্তিকে সুন্দরী, গ্যালিভারকে ভুঁড়িওয়ালা, ক্যাসাবিয়াঙ্কাকে বোকা, প্রমাণ করতে তাঁর জুড়ি নেই। অহেতুক প্রসঙ্গটা টেনে এনেই ক্লাসে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেন। কখনও বলেন, আমার পায়ের স্যাণ্ডেল ক্ষয়ে গেছে, পাঞ্জাবীর পকেট চাবীর ভারে

ফুটো হয়ে গেছে। মাথার চুল ভেজাল তেলের জন্য খসে পড়ছে কিন্তু গলার স্বর একটু ও দুর্বল হয়নি। আজ দশ বছর ধরে তোমাদেরকে ফুল ভুলিয়ম চরাচ্ছি।

উঠতি বয়সের ছেলে আমরা। সদ্য সিগারেট খাওয়া শিখেছি। নিজেদের নায়ক ভাবছি খুব অল্পদিন আগে থেকে। এসময় 'চরাচ্ছি' শব্দটা রিতীমত অবজাকসানবল্। কিন্তু স্যারের উপাধীটা স্মরণ করে মনে নিতাম না কিছু। রাগ করবোই বা কি? সিগারেট খেতে গিয়ে যারা হাত পোড়াই স্যার সেই দলেরই একজন।

ঘন্টা পরার পরও স্যার চালিয়ে যাচ্ছেন। চক, ডাষ্টার গোছাতে গোছাতে বলে চলেছেন, 'হৈমন্তির চেহারাটা খুবই আকর্ষণীয় ছিলো, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

মনে হচ্ছিলো চিৎকার করে বলি, 'স্যার বন্ধ করুন আপনার চাপাবাজি। হৈমন্তি কালো কুৎসিৎ এমনকি খেঁদি পেঁচি হলেও আমরা রবী ঠাকুরকে কিচ্ছু বলছি না। এখন দয়া করে আপনি যান। আমার সোনিয়াকে বাসায় নিয়ে যেতে হবে। দেরী হলেই বিপদ। মেয়েটা আগুনের মতো সূর্য মাথায় নিয়ে ফার্মগেইটে দাঁড়িয়ে থাকবে। ওর কষ্ট হবে। রং ময়লা হবে।

আরো মিনিট দুই আমার নিঃশব্দ গালাগাল শুনে স্যার বেরিয়ে গেলেন। ততক্ষণে আমি আমার ফাইল পত্র গুছিয়ে নিয়েছি। হুড়-মুড় করে অন্য ছেলেদের ধাক্কাধুক্কি দিয়ে বের হয়ে এলাম। পড়িমরি হয়ে সোনিয়ার স্কুলের দিকে ছুটে গেলাম।

ঘড়ির কাঁটা আমার তাড়া বুঝলো না। অন্যসব দিনের চেয়েও

বেশি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোতে লাগলো। আমাকে বিশ মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখলো গনগণে রোদ্রের নীচে। দু'চোখের পাতা পড়ছে না। স্কুলের গেটে স্থির। কানে অন্য কোন শব্দ ঢুকছে না, শুধু প্রতিক্ষা, কখন বাজবে ছুটির ঘণ্টা।

এক সময় বাজলো। হুড়মুড় করে মেয়েরা বের হয়ে এলো। পাশ দিয়ে কত বাতাবী আর বাতাসী চলে গেলো। কোনদিকে খেয়াল নেই। শুধু একটা মুখ খুঁজছি আমি—আমার সুইট হার্ট।

'ইস ঘেমে কি হয়েছেন? পকেটে রুমাল থাকলে মুখটা মুছুন।'

কে বোঝাবে ওকে? ওর জন্য আমি ঘাম কেন (?) বুকের রক্তও ঝরাতে পারি। ওকে সাথে করে নিয়ে যাবো। একি আমার কম পাওয়া? এ যে আমার জন্ম-জন্মান্তরের চাওয়া। একদিন ও আমার পিচ্চি বৌ হবে। নিজের ওড়না দিয়ে আমার ঘাম মুছিয়ে দেবে। একটা চুমু দেবে। তারপর ধাড়ি বৌ হবে। শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঘাম মোছাবে।

'কি ভাবছেন সিমুল ভাই?'

চমকে উঠলাম সেনিয়ার কথায়। 'কই কিছু না-তো বরং রিক্সা খুঁজছি।'

'আপনি কিছু একটা ভাবছিলেন, আমাকে ফাঁকি দিচ্ছেন।'

'শুনবে কি ভাবছিলাম?'

'বলুন না।'

'ভাবছিলাম, তুমি কবে তোমার আঁচল দিয়ে আমার এই ঘাম মুছিয়ে দেবে?'

'ধ্যাৎ।'

'লজ্জা পেলে?'

'এসব বললে আমি আপনার সঙ্গে যাবো না কিন্তু।'

'ঠিক আছে, আর বলবো না। কিন্তু কাজটি তোমাকে একদিন করতেই হবে।'

'ফের—'

'এই রিক্সা—'

রিক্সা ডাকলাম। দু'জনে পাশাপাশি চড়লাম। আমার নাকে লাগছিলো ওর ঘামের ঘ্রাণ। সকালের শিউলি মনে হচ্ছিল। ওর গায়ে গা ঠেকছে। সূর্যের চেয়েও গরম ওর গা। আমার গা-কে তাতিয়ে দিচ্ছে। মনে হলো ওর রোদরাঙা লালচে মুখে একটা চুমু এঁকে দেয়। পারলাম না। অনেক কষ্টে মনকে সংযত করলাম।

ঐ জায়গাটা পার হলাম। ওখানে আমি আজ সোনিয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে নেই। বরং ওর রিক্সায়, পাশাপাশি। খুব আনন্দ হলো। মহল্লার মধ্যে—ভাবতেই কেমন লজ্জা লজ্জা লাগলো। ছোকরারা নিশ্চয় টিটকিরি মারবে পরে। শালারা দেখলেই হয়।

পথ খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেলো। আমার আনন্দ আর রিকসা ভাড়া দুটোই একসাথে খসে গেলো। তবুও প্রথম দিনের মতো সোনিয়ার পাহারাদারের চাকুরিটা ভালো লাগলো—খুব ভালো লাগলো।

ক'দিন পর। খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাশ করলাম।

লেকচার থেকে মূল্যবান পয়েন্টগুলো টুকে নিয়েছি। হ্যাণ্ড-

নোট করার সময় কাজে লাগবে। নোট বুকটা জিনসের ব্যাক পকেটে রেখে বেরিয়ে এলাম কলেজ থেকে। ঘড়ি দেখলাম, দুপুর দু'টো বেজে সাত মিনিট। তেইশ মিনিট আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

ইন্দিরা রোডের একটা হোটেলে ঢুকে এক কাপ চা খেলাম। বাক্স নিয়ে বসা একটা ছেলের কাছ থেকে সিগারেট কিনে ধরালাম। আহ, কি মিষ্টি ধোয়া! আমার বুক থেকে সমস্ত টেনশন ধুয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার সঙ্গে। ক্লাশ শেষ করে বেরিয়ে আসলেই একটা সিগারেটের নেশা চেপে বসে আমার। খালি পেটেও তখন অদ্ভুত লাগে সিগারেট।

ফার্মগেট। মানুষের ভিড়ের ভেতর দিয়ে সনির মিষ্টি মুখটা কল্পনা করতে করতে এগোচ্ছি। এ সময় মিহিগলার ডাকটা শুনলাম।

'সিমুল!'

থমকে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এ সময় আইল্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা শাড়ি পরা ইয়াং একটা মেয়ে হাত নাড়লো, আমাকে লক্ষ্য করে। চোখে চোখ পড়তেই আমার বুকটা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো। আমাদের বাসা থেকে তিন বাড়ি দূরে এক ইঞ্জিনিয়ার ভাড়া থাকেন। ওর ওয়াইফ। আমি 'ভাবী' বলেই ডাকি ওকে। নামটা নীপা। নীপা ভাবীর চেহারাটা পাড়ার ইয়াং ছেলেদের একটা ফেবারিট টপিক। শাড়ি পরলে নীপাভাবী দর্শকদের জন্যে ফর্সা পেটের কিছুটা উন্মুক্ত রাখতে খুব ভালো-

যাসেন। ভদ্রমহিলা ইকনোমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস। বিদেশী ফার্মে চাকুরী করেন। সাজেন খুব চমৎকার স্টাইলে। ওকে দেখলেই ইয়াং ছেলেদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। নীপা ভাবীর হাজবেণ্ড ভদ্রলোক দেখতে ঠিক নিগ্রোর মতো। কালো, বিশ্রী চেহারা। আমি মাঝে মাঝে ভেবে পাইনা নীপা ভাবী এই বিশ্রী লোকটার কাছে নিজের মাখনের মতো শরীরটা খুলে দেন কি করে?

'ভাবী, তুমি?' সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

'হ্যাঁ। কলেজ থেকে ফিরছো?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তোমার কাজ আছে? আমার সঙ্গে যেতে পার একটু?'

গুডলাক। একটা চান্স পাওয়া গ্যালো। সনি আমার রিজার্ভের জিনিস। আজ না হয় ওর সঙ্গে না-ই গেলাম। কিন্তু নীপা ভাবীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর এই চান্সটা জীবনেও পাব না।

'কোথায় যাবে?'

'লালমাটিয়া।'

'লালমাটিয়াতে কি?'

'আমার বসের বাসা।'

'আফিশিয়াল এ্যাফেয়ারে?'

'হ্যাঁ, চলো, একটা রিকশা ডাকো।'

একটা রিকশা নিয়ে পাশাপাশি উঠে বসলাম। নীপা ভাবীর শরীর থেকে একটা চেনা সেন্টের গন্ধ ভেসে এলো। আমার হৃৎপিণ্ডটা খাচা ছেড়ে হাওয়ায় ভাসতে শুরু করলো। নীপা

ভাবীর নরম উরুর সঙ্গে আমার কঠিন উরুর ঘষা লাগছে। কাঁধ আর নিতম্বের চাপে আমি রিকশার সিটে কোনঠাঁসা হয়ে পড়ছি। নীপা ভাবী এসব মাইণ্ড করেন না। একটু ঘষা লাগলে আর কি হয়। নীপা ভাবীর ঘামের গন্ধে সৌরভ, কি সুন্দর।

'ভাবী?'

'কি?' ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো নীপা ভাবী।

'তোমার ।'

'শোনো,' বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলো নীপা ভাবী। 'তুমি আমাকে "ভাবী-টাবি" ডাকবে না।'

'তাহলে কি ডাকবো?'

'ম্যাডাম ডাকবে।'

'ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ। আর আমি তোমাকে বস্ বলবো।'

আমি হেসে ফেললাম। ভালোই বলেছে।

ম্যাডাম বললো, 'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। তুমি দেখতে লেডি কিলারদের মতো। তোমার পেছনে কোনো মেয়ে টেয়ে ঘোরে না?'

'নাহ্।'

'ঘোরে। তুমি জানো না।'

'আমি জানি না।' অবাক হয়ে বললাম।

'হ্যাঁ। য্যামন আমিও তোমার পেছনে ঘুরি কিন্তু তুমি একটা বোকা, কিছু বোঝো না।'

আমার বুকের ভেতরে দুপ-দাপ করতে থাকে। শরীরটা প্রথমে

ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তারপর উত্তপ্ত হতে থাকে। আমি আড়চোখে নীপা ভাবীর মুখের দিকে তাকাই। নীপা ভাবীর মুখটা একটু একটু ঘামছে। গলার নিচটা দেখতে পাচ্ছি, স্বর্ণের চিকন চেইন ঝিকমিক করছে নরম অঙ্গে। এক্ষুণি আমার ইচ্ছে করছে ওখানটায় আমার ঠোঁট জোড়া চেপে ধরি। নীপা ভাবী সামনের দিকে দৃষ্টি রেখেই বললেন, 'কি দেখছো অতো ?'

'তুমি খুব সুন্দর, ম্যাডাম।'

'আমাকে তোমার পছন্দ হয় ?'

'পছন্দ হলেই বা কি হবে।'

'রস্, তুমি একটা গাধা।'

আমি চুপ করে থাকি। রিকশা লালমাটিয়া পৌঁছে যায়। একটা ছোট একতলা বাড়ির সামনে রিকশা থামাতে বলেন নীপা ভাবী। ভাড়া দিয়ে আমার একা হাত চেপে ধরে বলেন, 'চলো।'

একটা ছোটো কাজের ছেলে দরোজা খুলে দিলো। ভেতরে ঢুকে নীপা ভাবী বললেন, 'বাড়িটা চিনেছো ?'

'হ্যাঁ। ক্যানো ?

'এখানে এসো মাঝে মাঝে। আসলে আমি খুব খুশী হবো।'

'গার্ডেন রোডের বাসা ছেড়ে দিয়েছো ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বস কোথায় ?'

'এই যে আমার সামনে।' আমার বুকে একটা খোঁচা দিয়ে বললেন নীপা ভাবী।

থতমত খেয়ে চেয়ে থাকলাম। 'তোমার হাজবেণ্ড ?'

'ওর সঙ্গে তো ডিভোর্স হয়ে গ্যাছে। এটা আমার বাপের বাড়ি। বাবা নেই। শুধু মা আছেন। উনি সারাদিন শুয়েই থাকেন, অসুখ, প্যারালাইসিস।'

'হঠাৎ ডিভোর্স ?'

'হ্যাঁ। এসব জানতে চেও না। আমি এখন মিস নীপা। তুমি আমার বস্। সব সময় একা থাকবো। মাঝে মধ্যে এসো। আসবে ?'

আমার মাথাটা সামান্য কাত করলাম। বুঝতে পারলাম ভাবী ডাকতে কেনো বারণ করেছে।

'দাঁড়িয়ে র'লে ক্যানো, বসো।'

একটা সোফায় বসে পড়লাম। একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে আগুন ধরাচ্ছি। আমার কাছে এই সমাজ, সংসার, পৃথিবী,—সব অর্থহীন মনে হতে লাগলো। ড্রামা—লাইফ ইজ ফুল অফ ড্রামা।

'সিমুল ?'

'বলো।'

'তুমি এখন থেকে আমাকে নিপা ডাকবে।'

'শুধু নীপা ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি বয়সে···।'

'চুপ্। মেয়েরা সব সময় পুরুষদের কাছে ছোটো।'

আমি নিঃশব্দে সিগারেটে পাফ করতে থাকি। আমার কাছে সব

কিছু ওলট-পালট মনে হয়। সিগারেটের মাথায় দীর্ঘ এক টুকরো ছাঁই জমে। আমি কোথায় ছাঁই ফেলবো, খুঁজে পাই না। সাজানো গোছানো ছোট্ট একটা ড্রইংরুম। ফ্লোরে দামী কার্পেট বিছানো। অথচ সামনের টি টেবিলে কোনো এ্যাশট্রে নেই। কার্পেট থাকলে সাধারণতঃ একটা এ্যাশট্রে রাখতেই হয়। কিন্তু এখানে নেই। এক পাশে একটা বুক সেল্‌ফ। তাতে থ্রীলার, ওয়েস্টার্ণ; সাইন্সফিক-শন আর ডিটেকটিভ বই রাখা। সবগুলো ইংরেজী পেপার ব্যাক। নীপা নামের রূপসী মেয়েটা কোথায় গ্যালো, খুঁজে পাই না। হয়তো শাড়ি বদলাতে গ্যাছে।

আমি চোখ বুঁজে সিগারেটে টোকা দিলাম। ছাঁইয়ের টুকরা-টা ইচ্ছে করেই কার্পেটের ওপর ফেলেছি। চোখ বন্ধ রেখেই ঘন-ঘন পাফ্‌ করছি, এসময় কেউ এসে গা ঘেঁসে বসলো। সালোয়ার কামিজ পরে এসেছে নীপা। ঠিক কিশোরীর মতো লাগছে ওকে। আমি জানি এই মেয়েকে এখনও বিয়ের মার্কেটে ছেড়ে দিলে নিমেষে হাওয়া হয়ে যাবে। আমার কাঁধে একটা হাত তুলে দিয়ে আচমকা গালে একটা চুমু খেয়ে বসলো নীপা।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখি নীপা রহস্যময় হাসি হাসছে।

'তুমি সত্যি আসবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'এসো। আদর যত্নের অভাব হবে না।'

বুঝতে পারি মেয়েটার এখন একটা ইয়াং পুরুষ দরকার। এই সুযোগটা নেবো নাকি? এরকম চান্স সবাই পায় না। আমি প্রাক্তণ ভাবীর বুক, নিতম্ব আর উরু সন্ধির দিকে ভালো করে চোখ

ঝুলিয়ে নেই।

'কি বুঝছো?' হেসে জিজ্ঞেস করলো নিপা।

'আসবো, আমি আসবো।' হঠাৎ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফেললাম ওকে। টেনে আনলাম বুকের ওপর। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলাম সজোরে। আপত্তি করলো না আমার সো কল্ড ভাবী। নরম ঠোঁট চুষতে খুব মজা। আমি পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ওকে বুকে নিয়ে আদর করতে থাকি। তারপর নিঃশব্দে একসময় থেমে যাই। সনির মুখটা ভাসছে আমার চোখের সামনে। আমার এ সব উচিত নয়। ছেড়ে দিলাম নীপাকে। একদম অভদ্রতা হয়ে যাবে ভেবে বললাম, 'ইউ আর ভেরী লাভলী। আই মাস্ট কাম টু মেক লাভ।'

'ইউ আর ওয়েল কাম।'

'থ্যাঙ্কিউ।'

বাসায় ফিরলাম বিকেল তিনটায়। পাঁচটার দিকে ছাদে উঠে দেখি, সনি চুপচাপ মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে ছাদে উঠতে দেখেই সরে গ্যালো ও। সিঁড়ির কাছে রাখা একটা চেয়ারে আমাকে পেছন দিয়ে উল্টোমুখী হয়ে বসলো। তারপর চেয়ারের ব্যাক রেস্টে হাত রেখে তার উপর চিবুক নামিয়ে রেখে চেয়ে থাকল অন্যদিকে।

আমার বুকটা ব্যথায় টনটন করে উঠলো, সনি আমার সঙ্গে রাগ করেছে? ক্যানো রাগ করবে? আমি স্কুলে ওকে আনতে

যাইনি বলে ? নাকি রিনির সঙ্গে কালকের ঝড়ো আবহাওয়ার কোন আভাস পেয়েছে ও ?

মৃদু স্বরেড াকলাম, 'সনি ?'

সাড়া দিলো না ও। ওর পেছন দিকটা দেখতে পাচ্ছি, ছোটো-খাটো সুইটেবল নিতম্ব। পিঠের ওপর ঝরে পড়েছে গোছা গোছা দির্ঘ খোলা চুল। শাদা রঙের কি একটা ফুল কানের কাছে গুঁজে রাখা। পরণে স্কার্ট।

'সনি ?' আবারও ডাকলাম।

জবাব দিলো না সনি। চেয়ারে স্থির হয়ে বসে থাকলো ও।

আমি নিঃশব্দে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে চলে এলাম ওদের ছাদে। পা টিপে টিপে ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। টের পেলো না সনি। আশপাশের ছাদগুলো আগেই দেখেছি, লোকশূন্য। তাছাড়া সনি এ্যামন একটা জা'গায় গিয়ে বসেছে, যেখানে অন্য ছাদ থেকে কেউ দেখবে না ওকে।

একটা চেয়ার এনে ওর পাশে বসে পড়লাম। কিন্তু মোটেও পাত্তা দিলো না ও। যেভাবে বসেছিলো, সেভাবেই বসে থাকলো। আমি আলগোছে ওর পিঠ থেকে চুলের গোছাটা তুলে নিয়ে ডাক-লাম, 'সনি ?'

'ধ্যাৎ! তুমি এখান থেকে যাও তো!'

"তুমি!" আমার বুকটা অবশ হয়ে এলো। আমার চিড়িয়া এ্যাতোদিনে সঠিক সম্বোধন করেছে আমাকে।

মৃদুস্বরে বললাম, 'রাগ করেছো ?'

চুপ করে থাকলো সনি।

'সনি ?'

সাড়া নেই।

'সনি প্লিজ, বলো না তোমার কি হয়েছে ?'

'কিচ্ছু হয়নি।'

'তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলছো না ক্যানো ?'

'আমার ইচ্ছা সেটা।'

'ক্যানো ?'

সনি নিশ্চুপ।

'বলো না ক্যানো ?'

'তুমি স্কুলে যাওনি ক্যানো ?' অভিমানের সুরে বললো সনি।

'হঠাৎ একটা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম। তাই আসতে পারিনি।'

'যদি ওরা আমাকে কিছু বলতো ?'

'ওদের জিভ ছিঁড়ে ফেলতাম।'

'তোমাকে আর যেতে হবে না।'

'সনি, প্লিজ, রাগ করো না। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।'

'আমি পারবো না।'

'কি পারবে না ?'

'তোমাকে ভালোবাসতে পারবো না।'

'হাত জোড় করলাম, দাও, মাফ করে দাও।'

সনি আমার জোড় হাতে সরোষে ঘুষি মারলো একটা। আমি

ওর দিকে পিঠ পেতে দিয়ে বললাম, 'শাস্তি দিতে চাইলে এখানে মারো।'

সনি সত্যি সত্যি একটা ঘুষি মেরে বসলো। পরমুহূর্তে 'উফ' করে নিজের হাত ঘষতে লাগলো। 'ইস্, তোমার পিট না দেয়াল?'

হেসে ফেললাম। ওর হাতটা টেনে নিয়ে বললাম, 'ব্যথা পেয়েছো?'

'হ্যাঁ।'

তাহলে আবার মারো।'

'মারবো?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'যেখানে খুশী।'

'ঠিক আছে। তোমার মুখটা কাছে আনো—একটা পাঞ্চ করবো।'

আমি চোখ বুঁজে মুখটা বাড়িয়ে দিলাম। আচমকা আমার বড় বড় চুল দু'হাতে মুঠ করে ধরলো সনি। 'নড়বে না কিন্তু।'

'নড়বো না।'

আমার দু'গালে দু'টো চুমু খেলো সনি। পরমুহূর্তে ছুটে পালালো।

এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ছুটলাম ওর পিছু-পিছু। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছিলো ও। জাপটে ধরে ফেললাম। শক্ত করে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললাম আমার সুইট হার্টকে।

মনে মনে বললাম, 'ছোটা পাখী ছোটো পাখী, কোথা যাও নাচি নাচি ?'

সেকেণ্ডে পাঁচটা করে চুমু খেতে শুরু করলাম সনির সারা মুখে। আমার বুকে সনির জন্যে যত আদর জমা ছিলো সব যানো এক সঙ্গে ঠোঁটে এসে ভিড় করলো আমি ঠোঁট চোখ, কপাল নাক, গলা, বুক—সবখানে চুমু খেতে-খেতে অস্থির করে তুললাম। একসময় ও আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফেলে বললো, 'সিমু, প্লিজ, থামো

থেমে গেলাম আমি। হাঁপাতে হাঁপাতে তাকালাম ওর চোখে। সনি বললো, 'ছাড়ো তো, দেখে ফেলবে কেউ।'

আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলাম ওর চোখে। ধীরে ধীরে বললাম, 'একবার বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমি তোমার সুইট হার্ট।'

সনির ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি ঝিকমিক করে। বুকের সঙ্গে ওকে আরেকটু জোরে চেপে ধরি। 'বলো না।'

'বলবো ?'

'হ্যাঁ, বলো।'

'কি বলবো ?'

'বলো যে তুমি আমাকে ভালোবাসো।'

'হ্যাঁ, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।'

'শেখানো বুলি আওড়াচ্ছো ?'

'না, সত্যি, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। তুমি আমাকে

এ্যাতো ভালোবাসো, আর আমি এটুকু বাসতে পারবো না ?'

আমি কথাটা শুনে পাগল হয়ে গেলাম। সনিকে সজোরে চেপে ধরলাম বুকে ওর গলার কাছে মুখ গুঁজে স্থির হয়ে থাকলাম সেকেণ্ড পাঁচেক। আজ আমি ওকে জয় করতে পেরেছি আজ আমার স্বপ্নকে আমি বাস্তবে দেখছি। আমার ক্যানো জানি চোখ ভিজে টলমল করতে করতে কয়েকটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো।

সনি অবাক হয়ে চেয়ে থাকলো আমার চোখের দিকে। তারপর মৃদু একটু হেসে দু'আঙ্গুলে মুছে দিলো। আমি গভীর আদরে ওর নাকে নাক চেপে ধরি। সনি চোখ বুঁজে থাকে। তারপর ফিস-ফিস করে বলে, 'আই লাভ ইউ, রিয়েলি। ইউ আর অলসো মাই সুইট হার্ট।'

আমিও ওর কানে কানে বললাম, 'ইউ আর অলসো মাই সুইট হার্ট।' কি এক অজানা আনন্দে আমার কণ্ঠস্বর বুঁজে আসছিলো। ও আমার অনেক দিনের সাধনা। আমি যেন এই মুহূর্তে দিগ্বিজয়ী বীর। সোনিয়াকে জয় করেছি। ওর গালে নিজের গালটা এক-বার বুলিয়ে নিলাম। আমার সবটুকু আনন্দাশ্রু ব্লোটিং পেপারের মতো চুষে নিলো ওর নরম গালের প্রতিটি মসৃণ লোমকূপ। আমি আজ ধন্য। মুখটা ওর কানের পাতি বরাবর রাখলাম। তারপর ফিসফিসিয়ে বললাম, 'মাই সুইট হার্ট।'

নয়

'মা ?'

'কি ?'

'কিছু টাকা দরকার।'

'কত ?'

'মাত্র পাঁচ শ'।'

'কী !'

'মাত্র পাঁচ শ' !'

'আমি কি টাকার গাছ নাকি ?'

'না, তা নও। কিন্তু আমার টাকার যে খুব দরকার।' বলতে বলতে মা'র নামাজের বিছানায় হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লাম।

'কি দরকার, শুনি।'

'তোমার ছোটো বউ-মা'র কাল জন্মদিন একটা কিছু গিফট না প্রেজেন্ট করলে প্রেস্টিজের চাকা পাম্পচার হয়ে যাবে।'

মা'র চোখ দুটো কৌতূহলে চিক চিক করতে থাকে। আমি এ লক্ষণটা বেশ চিনি। কোনো মেয়ের কথা শুনলেই মা'র চোখ জোড়া অদ্ভুত একটা স্নেহের স্রোতে ভাসতে থাকে। মা'র এই

দুর্বলতাটার খবর খুব ভালো করেই রাখি। আমার কোনো বোন নেই। বোন নেই—এ রকম কোনো দুঃখ আমার নেই। বরং বোন থাকলেই ঝামেলা মনে হতো আমার। আজ কলেজে নিয়ে যাও, কাল লিপিস্টিক কিনে আনো, পরশু পাড়ার ছেলেরা ওকে চোখ টিপলে হকিস্টিক নিয়ে ছোটো—এসব ঝামেলা আমার সহ্য হয় না, হতোও না। আমি খুব খুশী। কোনো শালা আমাকে শালা বলতে পারবে না। কিন্তু বিপদ হলো মাকে নিয়ে। মা'র বড় শখ একটা ইয়াং স্মার্ট যুবকের শাশুড়ি হওয়ার, একটা মেয়ের মা হওয়ার। যে মা'র চুল আঁচড়ে দেবে, হাত-পা টিপে দেবে। মা'র অসুখে সেবা যত্ন করবে আর খুব চিকন গলায় মা-মা করে কিচির মিচির করবে। মাঝে মাঝে নাকে কাঁদবে।

আমি হচ্ছি দুরন্ধর শয়তান। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর চেষ্টা করি। মায়ের আপন মেয়ে নেই তো কি হলো, আমি যাদের সঙ্গে প্রেম করবো তারা তো আছে।

মা নড়ে চড়ে বসেন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। 'তুই মেয়েটাকে নিয়ে আসতে পারবি?'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার, আমার কাছে।'

'তুমি ওকে দেখতে চাও?'

'হ্যাঁ।' মা সরল ভঙ্গিতে হাসেন।

'দেখলে দেবে তো পাঁচ শ' টাকা?'

'আচ্ছা দেবো।'

আমি টিটিস্-টিস্ করে তিনবার তুড়ি বাজালাম। 'ওকে, চলো তোমাকে এক্ষুনি দেখাচ্ছি

মা'র চোখ জোড়া বিস্ময়ে ভরে যায়। কণ্ঠটা একদম নিচুগ্রামে নেমে আসে। 'এখানেই আছে নাকি?'

আমি হাসতে থাকি। 'হ্যাঁ। আমার রুমে।'

ভারী শরীরটা নিয়ে খুব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান মা। মা'র হাত থেকে তসবীহ'র মালাটা খসে পড়ে। আমি তসবিহ্টা তুলে দিয়ে মাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে যাই।

আগেই সব প্ল্যান করে রেখেছিলাম। মা রুমে ঢুকতেই সনি পা ছুঁয়ে সালাম করবে। যদিও আজ কালকার মেয়েদের এসব শেখাতে হয় না। প্রসনজিৎ আর মিঠুন অনেক আগেই শিখিয়ে দিয়েছে।

আমার রুমের সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন মা। মাকে খুব অস্থির দেখাচ্ছে। উত্তেজনা অনুভব করছেন তিনি। 'সিমু, একটু দাঁড়া।' শাড়ির আঁচল থেকে চাবির গোছাটা ব্যস্ত হয়ে খুলতে চেষ্টা করেন মা।

আমি মাকে হেল্প করি। চট করে চাবির রিঙ থেকে শাড়ির আঁচলটা খুলে দেই। মা'র হাতটা একটু একটু কাঁপতে থাকে। চাবিটা আমার হাতে দেন মা। 'আলমিরা থেকে দুটো নোট নিয়ে আসবি, যা—তাড়াতাড়ি যা, আমার দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে।'

আমি ছুটতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। 'কত টাকার নোট, মা?'

'হ্যাঁ? পাঁচ শ' টাকা—পাঁচ শ' টাকার নোট।'

সর্বনাশ। মনে মনে ভাবলাম। মা আজকেই বিয়ের মন্ত্রটা পড়িয়ে ছাড়বে নাকি? আমি দু'মিনিটের মধ্যে আলমিরা খুলে পাঁচ শ' টাকার বাণ্ডিলটা পেয়ে গেলাম। ভেতরে তাকিয়ে আমার গলা শুকিয়ে গ্যালো। এ্যাতো টাকা! সব বাবার ঘুষের টাকা। বাবা নাকি মাসে দু'লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ কামিয়েছিলেন। এ্যাতো দিন বিশ্বাস করিনি। এখন চোখের সামনে সারে সারে সাজানো পাঁচ শ' টাকার বাণ্ডিল দেখে আমার মাথা ঘুরছে। সব ব্ল্যাক মানি। তাই বাবা ব্যাংকে রাখেন নি টাকাগুলো।

একটা পাঁচ শ' টাকার ব্যাণ্ডিল মেরে দেবো নাকি? ভাবলাম। ওরে বাবা! আমার হাত বাড়াতেই সাহস হলো না। পটাপট পাঁচটা নোট খসিয়ে ব্যাক পকেটে চালান করে দিলাম। তারপর আরো দু'টো নোট টেনে খসিয়ে বন্ধ করে দিলাম আলমিরা।

মা দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। চাবি আর নোট দুটো হাতে দিলাম মা'র। মা একটা নোট আমার হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, 'এটা তুই রাখ।'

আজ আমি দস্তুর মত কিং। নিজেকে খুব দামী দামী মনে হলো আমার। এ্যাতো সুখ কোথায় রাখবো? আমার জানের জান সনি আমার বুকে ধরা দিয়েছে। আর কচকচে ছ'টা নোট আমার পকেটে এসে পড়েছে। কোথায় যাই? খুশীতে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করেছিলো।

খুব সন্তর্পণে দরোজায় ধাক্কা দিলাম। হা হয়ে গ্যালো কপাট। মাকে এক হাতে জড়িয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সনি চুপটি করে বসে

রয়েছিলো সোফায়। মাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। মাকে ভালো করেই চেনে ও। আগে ডেইলি আসতো। কিন্তু মা'র মস্তিষ্কের মেমোরী সেলগুলো একদম ফাঁকা। খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে না মিশলে মা কারো চেহারাই মনে রাখতে পারেন না।'

মা রুমে ঢুকেই স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। মা'র চোখ জোড়া আনন্দের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ঠোঁট জোড়া মৃদু মৃদু কাঁপছে।

আমি হেসে বললাম, 'মা, এই হচ্ছে সনি।'

'এসো, মা, এসো।' সামনে পা বাড়ালেন মা।

সনি উঠে এলো। চট করে মা'র পায়ের কাছে বসে পড়ে সালাম করলো। লক্ষ্য করলাম, সনিও কিছুটা ঘাবড়ে গ্যাছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মা ওকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে দুই নারীর মহা-মিলন দেখছি। সনি এ্যামনিতেই মাকে খুব ভালোবাসতো আর শ্রদ্ধা করতো। প্রত্যেক ঈদে মা'কে পা ছুঁয়ে সালাম করে। আমাকে প্রায়ই বলতো আপনার মা খুব সরল। আমার খুব ভালো লাগে।

ছোট্ট বাচ্চার মতো মা'র বুকে মুখ লুকিয়ে থাকলো সনি। আমার চিড়িয়াটা সত্যিই খুব ফর্মাল। খুব ইনোসেন্ট ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেই ডাবল সোফায় গিয়ে বসলেন মা। সনিকে খুব কাছে বসিয়ে হঠাৎ শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। আমি বুঝতে পারলাম, মা কাঁদছেন।

এক হাতে সনিকে জড়িয়ে ধরে রেখে মা ওর হাতে পাঁচ শ' টাকার নোটটা গুঁজে দিলেন। সনি খুব অবাক হয়ে গ্যালো। মা

দ্রুত বললেন, 'রাখো, এটা আমার দোষ। তুমি ঠিক আমার মেয়ের মতো।' বলতে বলতে আমার দিকে তাকালেন মা। তারপর হাতের ইশারায় বললেন, 'তুই যা।'

আমি রুম থেকে বেরিয়ে এলাম।

ভাইয়ার রুম থেকে খটা-খট টাইপ করার শব্দ আসছে। উঁকি দিতেই ভাইয়া দেখে ফেললেন। চলে যাবো, এ সময় ভইয়া ডাকলেন 'শোন্।'

ঘুরে দাঁড়ালাম।

'মা কোথায়?'

'আমার রুমে।'

'তোর রুমে?'

'হ্যাঁ। মা'র একটা ফ্রেণ্ড এসেছে—খুব আলাপ করছে।'

'মা'র ফ্রেণ্ড?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভাইয়া। 'কোত্থেকে এসেছে?'

'এই তো, পাশের বাসা থেকে। সনি। হানি'পার বোন, পিচ্চিটা।'

'অ, সনি,' বলেই আবার চেয়ারে বসে পড়লেন ভাইয়া। তারপর সন্দেহজনক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন আমার দিকে।

আমি তাড়াতড়ি কেটে পড়লাম। ভাইয়া পেছন থেকে আবার ডাকলেন, 'এ্যাই, শোন-শোন।'

ঘুরে এগিয়ে গেলাম। 'কিছু বলবে ভাইয়া?'

'কাজের মেয়েটাকে এক কাপ কফি দিতে বল্। আর, ধর, এক

প্যাকেট বৃটিশ ফাইভ সিগারেট এনে দে।'

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে পঞ্চাশ টাকার দু'টো নোট দিলেন ভাইয়া।

আশি টাকায় এক প্যাকেট বিদেশী ফাইভ কিনে আনলাম। বাকী টাকা ফেরত দিতেই ভাইয়া হাত নেড়ে বললেন, 'নিয়ে যা।' কোথায় যাই। এই সুখ কোন পকেটে রাখি। আজ শুধু টাকার খস্-খস শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

তিন ঘণ্টা বসে থাকলাম ড্রইংরুমে। মা এখনও সনিকে ছাড়েনি। বেশ ক'বার গিয়ে দরোজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েছি। সনিকে খুব খুশী-খুশী দেখালো। মা'র সঙ্গে চুটিয়ে আলাপ করছে। মেয়েরা এ্যাতো কথা বলতে পারে—বাপরে বাপ!

সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। মাকে গিয়ে বললাম ওকে এবার ছেড়ে দিতে। সনিকে বললাম, 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

কাঁচুমাচু হয়ে সনি বললো, 'আরেকটু পরে যাই।'

আমি কি বলবো বুঝে উঠতে পারলাম না।

সনি বললো, 'ঠিক আছে, চলো।' মার দিকে ফিরলো ও। 'আন্টি আসি।'

মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি ডেইলী একবার আসবে।'

'আচ্ছা, আসবো।'

সিঁড়ি দিয়ে নামছি। সনি আমার পেছনে। মিডল ল্যাণ্ডিঙে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে ফেললাম ওকে। 'সনি, মাই হার্ট!'

চুপটি করে আমার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলো সনি। চোখে-চোখে চেয়ে আছি দু'জনে।

'কিছু বলবে?' হেসে জিজ্ঞেস করলো সনি।

'আই লাভ ইউ, সনি।'

'আই লাভ ইউ, টু।'

'ইউ আর মাই সুইট হার্ট।'

'ইউ আর টু।'

'তোমার কষ্ট হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ক্যানো? কষ্ট হবে ক্যানো?' সনি অবাক।

'মা তোমাকে এ্যাতোক্ষণ আটকে রাখলো।'

'তাতে কি? আমার খুব মজা লেগেছে। তোমার আম্মু না যা ভালো, ইস্।'

'তোমার ভালো জেগেছে?'

'হ্যাঁ, খু-উ-ব।'

'শাশুড়ি হিসেবে ক্যামন?'

'যাহ্।'

'বলো না, প্লিজ।'

'তুমি কিছু বলেছো আন্টিকে?'

'হ্যাঁ। বলেছি, তোমাকে আমি বিয়ে করবো।'

'যাও, একথাটা ক্যানো বলতে গ্যালে?'

'বললে ক্ষতি কি? মা এসব মাইণ্ড করেন না।'

'সে জন্যেই তো এ্যাতোগুলো টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। এ্যাতো টাকা দিয়ে কি করবো আমি?'

'রেখে দাও, কোর্ট ম্যারেজের সময় লাগবে।'

হেসে ফেললো সনি। 'কোর্ট ম্যারেজের দরকার হবে না। সবাই রাজী থাকবে দেখো।'

'তোমার আম্মু?'

'আম্মু? আম্মু তোমাকে খুব পছন্দ করে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। তুমি নাকি খুব ভদ্র।'

'ভদ্র?' হেসে ফেললাম। 'আমার মতো নাম্বার ওয়ান শয়তান এই শহরে আর নেই।'

'ক্যানো? একথা বললে ক্যানো?'

'বললাম ক্যানো? শোনো, মিসেস সজিদা সুনমের পিচ্চি মেয়েটার সঙ্গে যে তলে-তলে বউ-জামাই খেলা শুরু করে ফেলেছি তা তো আর তোমার মা জানেন না। তাই খুব ভদ্র ভাবলেন

সনি হাসতে থাকে। ওর নিষ্পাপ চোখে আমি নিঃশব্দে চেয়ে থাকি; খুব কাছ থেকে। আমার খুব ইচ্ছে করে ওকে নাক টিপে আদর করি

'কাল আমার জন্মদিন, মনে আছে?' জিজ্ঞেস করলো সনি।

'হ্যাঁ। কার্ডটা কোথায় রেখেছিলে?'

'তোমার স্টাডি রুমের টেবিলের ওপর।'

'গুড। ভেরী গুড।'

'আজ আসি?'

'ওকে, লাক।'

'লাক।'

দশ

পরের সপ্তাহ।

রাত তখন ন'টা। এসময় এমন একটা কথা শুনবো আশা করিনি। পৃথিবীটা ভেঙ্গে পড়লেও বোধ হয় কম আশ্চর্য হতাম। কিন্তু কি ভাবে কি হলো কিছুই বুঝতে পারলাম না।

মা-ই এসে জানালো সোনিয়া ফোন করেছে। এঘর থেকেই ফোনের ঘন্টা শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু সোনিয়ার ফোন পেয়েও মা বেশীক্ষণ কথা বললেন না কেন? মায়ের এক দোষ, আগেই বলেছি। মেয়েদের ফোন পেলে নিজেকেই মায়ের আসনে বসান উনি।

'হ্যালো সনি।'

'অপর প্রান্ত থেকে কোন শব্দ এলো না।'

'হ্যালো সনি?'

অপর প্রান্ত চুপ।

'হ্যালো হু ইজ দেয়ার? প্লিজ স্পিক আউট।'

'আমি সোনিয়া।'

'তা-তো বুঝলাম, কিন্তু কি মনে করে মাই সুইট হার্ট?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারবো না।' কাঁপা কণ্ঠ সোনিয়ার।

আমার বুকে কেউ যেন বর্শা ছুঁড়ে মারলো 'কি বললে?'

'আমি আজ থেকে আর তোমার নয়

সোনিয়া প্লিজ মাথা ঠাণ্ডা কর।'

'আমি মাথা ঠাণ্ডা

'তাহলে তুমি কাঁদছো কেন?'

'তোমার মতো জঘন্য ছেলের জন্য আমি কখনই কাঁদবো না, কথাটা মনে রেখো।'

'সোনিয়া তুমি আমাকে আঘাত করছো কিন্তু।'

'তোমাকে…' কথা আঁটকে গেলো অপর প্রান্তের।

'কি হয়েছে ব্যাপারটা খুলে বলতো।'

'আমার সাথে আর কোন সম্পর্ক নেই তোমার। তুমি আমার কাছে আর কখনও এসো না।'

'তুমি কি বলছো?'

'ঠিকই বলছি—, আমি তোমাকে ঘৃণা করি।'

'সোনিয়া…।'

লাইন কেটে গেলো। রিসিভার ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম বোবার মতো। আমার সুখের স্বপ্ন এতো তাড়াতাড়ি এভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, ভাবতেও পারি না। দু'চোখ ভরে এলো পানিতে। চোখ মুছে ষ্টাডিরুমে এলাম। গোলাম আলির গজল বেজে চলেছে 'ছুপ ছুপ কে রোনা ইয়াদ হ্যায়।' বুকের ভেতরটা টন

টন করে ব্যথা বাড়তে লাগলো। বালিশে মুখ চেপে চুপচাপ শুয়ে রইলাম।

বিষণ্ণ সুরের গানের সাথে শুনতে পাচ্ছিলাম দেওয়াল ঘড়িটার ঘণ্টা এগারোটা, বারোটা, একটা। না চুপচাপ শুয়ে থাকলে চলবে না। সোনিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। কোথাও একটা ফাঁক আছে। এ ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে হবে তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম, যাব এবং এখনই।

ছাদে উঠলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারপাশটা দেখে নিলাম। গভীর রাত। কুয়াশা ঢাকা আকাশ। লাফিয়ে সোনিয়াদের ছাদে এসে দাঁড়ালাম। বুকের ভেতরটা হাতুড়ি দিয়ে যেন কেউ পেটাচ্ছে। অন্ধকারে পা টিপে টিপে ওদের চিলে কোঠার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দরজা বন্ধ। দরজাটা রাত একটার সময় খোলা থাকবে না বোঝা উচিত ছিলো। অনেক চেষ্টা করেও সিঁড়ির দরজা খুলতে পারলাম না।

দূরে কোথাও নাইট গার্ড হুইশেল বাজালো। বুকটাও কেঁপে উঠলো। এ আমি কি ছেলেমানুষি করছি? চোর মনে করে যে কোন সময় কেউ আক্রমণ কিম্বা আঘাতও করতে পারে। মাথা ঠিক নেই।

স্যানিটারী পাইপটা চোখে পড়লো। হ্যাঁ ওটা বেয়েই কার্নিশে নামতে পারলে সোনিয়ার রুমের জানালা হাতের কাছেই পাওয়া যাবে, জানতাম।

সোনিয়ার জানালায় আলো জ্বলছে। মনের সব ভয় নিমেষেই

মুছে গেলো। কার্নিশে দাঁড়িয়ে জানালায় চোখ রাখলাম। সোনিয়া টেবিলে মাথা গুঁজে বসে রয়েছে। হয়তো কাঁদছে, বোঝা গেলো না।

'জানালায় টোকা দিলাম। বেশ ক'টা টোকা দিলাম।

'কে?' আঁতকে উঠলো সোনিয়া।

'আমি সিমুল।'

'সিমুল।' জানালার কাছে এগিয়ে এলো। 'কি চাও এখানে?'

'ছাদে এসো কথা আছে।'

'কখনও না।'

'কেন আসবে না ছাদে?' রাগ হলো আমার।

'ঘৃণায়।'

'সোনিয়া।'

'তুমি চলে যাও, তোমাকে আমি ঘৃণা করি।'

'তোমাকে বলতেই হবে আমার কি অপরাধ?'

'আমি কিছুই বলবো না, তুমি আর কখনও আমার কাছে আসবে না। তাহলে অপমান হবে।' জানালায় পর্দাটা টেনে দিলো।

'সোনিয়া তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছো।'

'নির্লজ্জের মতো এখনও দাঁড়িয়ে আছো? ছি:'

'সোনিয়া প্লিজ শোনো।'

'আমার সব শোনার শেষ।'

'সোনিয়া!'

'তুমি কি চাও আমি চিৎকার করে বাবা মাকে ডাকি ? নাহলে চোর চোর করে চিৎকার করি ?'

'তার দরকার হবে না।' অন্ধকারে আমার কান্না কেউ দেখতে পেলো না আমার চোখের পানি বাঁধ ভাঙ্গলো। কার্নিশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম। আমার অজানা অপরাধ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলাম। খুঁজে কিছুই পেলাম না। তবে এ কথা সত্য, আজ সোনিয়া, আমার সুইট হার্ট আমাকে প্রত্যাখান করেছে। মাথায় জিদ চড়ে গেলো। ঠিক আছে, আমিও ওকে ভুলে যাবো। যে মেয়েটা এমন চরম ভাবে অপমান করলো তাকে ভাবার কোন অর্থ হয় না।

তরতর করে পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে এলাম। লাফিয়ে নিজের ছাদে এলাম। রাত ভোর হয়ে আসতে বেশি দেরী নেই, ভোর রাতের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে।

ঘরে এলাম। বালিশে মাথা গুঁজে ঢুকরে ঢুকরে কাঁদলাম। অনেকক্ষণ ধরে, তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

দু'দিন পর।

রাত দশটা।

স্টাডি রুমে চুপচাপ বসে আছি। পড়ায় মন বসছে না। সোনির চেহারাটা ভেসে উঠছে বারবার চোখের সামনে। ওর কথা মনে পড়লেই বুকটা আচমকা শূন্য হয়ে যায়। একটা সিগারেট টানলাম। এ সময় খট করে দরোজায় একটা শব্দ হলো। ঘাড়

ঘুরিয়ে দেখি, মা।

'কাম ইন, মাই ডিয়ার, কাম ইন।' হেসে বললাম। মাকে আমার কষ্ট, আমার লজ্জা বুঝতে দিতে চাইনি আমি।

মা ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'তোর একটা ফোন এসেছে।'

'কোত্থেকে?'

'কি জানি।'

'নাম বলেনি?'

'বলেছে, একটা মেয়ে—রিনি।'

অজানা কৌতূহলে ছুটে গেলাম। দ্রুত ড্রইংরুমে গিয়ে রিসিভারটা তুললাম, 'হ্যালো?'

'সিমুল?'

'হ্যাঁ। কি ব্যাপার?'

'তোমাকে সেদিন একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'কি?'

'শোনো, কাল আমরা ক'টা বান্ধবী মিলে একটা পার্টি দিচ্ছি—ওয়াইন পার্টি। সব ঠিক হয়ে গ্যাছে কিন্তু, ওয়াইন কোত্থেকে আনবো বুঝতে পারছি না। এ কাজটা তোমাকে করে দিতে হবে।'

হতাশ হলাম। তবুও প্রস্তাবটা খুব ভালো লাগলো। লুফে নিলাম। 'পার্টি হচ্ছে কোথায়?'

'ধানমণ্ডি ১৫ নম্বরে। আমার এক বান্ধবীর বাসায়। তুমিও থাকবে সেখানে।'

'কাল কখন?'

'সকালে। জাস্ট দশটার দিকে।'

'মাথা খারাপ নাকি? সকালে ওয়াইন পার্টি হয় নাকি?'

'ধ্যাৎ, পার্টি-ফার্টি আসলে কিচ্ছু না। আমরা জাস্ট এনজয় করবো বিজনিসটা

'গুড, ভেরী গুড।' এরকমটাই মনে হয় আশা করছিলাম আমি।

'তুমি এনে দিচ্ছো তো?'

'হ্যাঁ। ক'বোতল দরকার

'শুধু একটা।'

'পাগল নাকি, একটা তো আমারই লাগবে। দু'দিন ধরে এস্তার মদ খাচ্ছি আমি। সোনিয়া আমাকে উপহার দিয়েছে ওটা।'

'আচ্ছা, তাহলে দু'টো। ফ্রেঞ্চ কনিয়াক আনবে। টাকা দিয়ে দেবো এখন?'

'পরে দিলেও চলবে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। আমাকে এক্ষুণি বেরোতে হবে। শ্যালে থেকে দু'টো বোতল এনে না রাখলে সকালে পাওয়া যাবে না। স্টাডি রুমে ফিরে এলাম। মা চুপচাপ বসে আছেন। বললাম 'একটু এখন বাইরে যাবো মা। যাবো আর আসবো। বলো না, মা যাবো?'

'তুই এসব ছেড়ে এবার পড়া লেখা কর।'

'তাড়াতাড়ি ফিরবি তো?'

আমি ড্রয়ার থেকে টাকা নিয়ে পকেটে ভরলাম। মাকে বললাম,

দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো। বেরিয়ে পড়লাম। সোনিয়া দেখুক, শিমুল কত নিচে নামতে পারে। ও মদ খাবে। ওর বোনের সঙ্গে পার্টিতে ফুর্তি করবে। সোনিয়ার এসব পাওনা। আগে যা করিনি আজ থেকে তা সব করবো। আমিও সিমুল।

একটা ব্যাগে করে নিয়ে এলাম বোতল দু'টো। আমার নিজের রুমে জিনিসটা রেখে দিলাম। রাতে খেতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু বাবা-মা আছে, তা সম্ভব না। অনেক রাত পর্যন্ত গান শুনলাম। মেহদী হাসানের গান। কাঁদতে কাঁদতে অনেক কষ্টেও মন থেকে সোনিয়াকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলাম না। তবুও একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

খুব ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। ঘুরে বেড়ালাম ভোরের ফাঁকা পথে। অনেক শিউলি ফুল পায়ে দলে হেঁটে বেড়ালাম। আটটার দিকে বাসায় ফিরে গোসল সারলাম। ন'টার দিকে বাসা থেকে বেরোলাম।

ইতস্ততঃ করে ঢুকে পড়লাম সনিদের বাসায়। সনির বাবার সঙ্গে সঙ্গে মুখোমুখি দ্যাখা হয়ে গ্যালো। ভদ্রলোক প্রত্যেক শুক্রবারে কোদাল নিয়ে লনের মাটিগুলো অযথা কুপিয়ে কুপিয়ে ওলোট-পালোট করেন। গত ছ'মাস ধরে শুনছি, এখানে চমৎকার একটা বাগান হবে। চমৎকারের কথা বাদ দিলাম, বাগানের চিহ্নটাও এখনও দেখতে পাইনি। ভদ্রলোক যথেষ্ট ভদ্র আর নম্র। বউ-এর অত্যাচারে ঘরে টিকতে পারেন না। তাই বেশির ভাগ সময়ই কোদাল

নিয়ে বাগান-বাগান খেলেন।

সনি ঠিক ওর বাবার মতোই। চেহারাটাও কিছুটা বাবার মতো। সরল, নিষ্পাপ।

আমাকে দেখেই সনির বাবা কোদালটা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ান। 'আরে সিমুল, কি খবর? তোর বাবা ভালো আছে তো।'

'ভালো। আপনি?'

'এই তো। বাগানটা ঠিক করছি। এখানে চমৎকার একটা বাগান করবো। অস্ট্রেলিয়ান অর্কিডের নাম শুনেছো?' ভেরী রেয়ার ফ্লাওয়ার। আমি এখানে অস্ট্রেলিয়ান অর্কিডের বীজ বুনবো। আমার এক ফ্রেণ্ড অস্ট্রেলিয়া থেকে বীজ পাঠাবে বলেছে। বীজের খুব দাম। এক গ্রামের দাম পাঁচ শ' টাকা।'

আমি নিঃশব্দে শুনে যেতে পারতাম। কিন্তু এটা ভদ্রতা হয় না। কিছু একটা 'হ্যাঁ-হুঁ' বলে সাপোর্ট করতে হয়। আমার মন খারাপ। তবু যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, 'ওহ, ভেরী নাইস! নাইস আইডিয়া অব গার্ডেনিং।'

আমার উৎসাহ দেখে সনির বাবার চোখ জোড়া খুশীতে চক-চক করতে থাকে। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে মাটি কোপাতে শুরু করেন।

আমি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাই। দোতলায় উঠে আসতেই হঠাৎ ঠিক সনির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ি। খুব ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিলো ও, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত

চোখে চেয়ে থাকলো।

'সনি?' আমার গলা কেঁপে গেলো।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়েই দৌড়ে চলে গ্যালো সনি। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম সিঁড়ির কাছে।

রাগ হলো নিজের ওপর। ওর নামটা জিভ ফসকে কেন উচ্চারণ করলাম? ও রাগ করে থাকতে পারে, অপমান করতে পারে, আমি পারবো না?

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম সিঁড়ির কাছে, জানি না। হঠাৎ দেখলাম সামনের বন্ধ দরোজাটা সাঁ করে খুলে গ্যালো। রিনি বেরিয়ে এলো।

'আরে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'কখন এসেছো?'

তাই তো! কখন এসেছি? আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমার হাতে একটা সিগারেট জ্বলছে! কখন ধরিয়েছি নিজেও জানি না।

'কি ব্যাপার কথা বলছো না ক্যানো? জিনিসটা এনেছো?'

'এনেছি।'

'চলো, এক্ষুণি চলো।' ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখলো রিনি। আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম মেয়েটার দিকে। স্কার্ট পরে খুকু সেজেছে মেয়েটা। কোমরে কালো রঙের বেল্ট। কোমরটা সরু দেখাচ্ছে। খুব যত্ন করে সেজেছে। ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক। চোখের

দু'পাশে বহু যত্নের হরেক রঙের প্রলেপ। আমি অস্বীকার করতে পারবো না, ওকে এখন খুব সুন্দর লাগছে—খুব সেক্সি মনে হচ্ছে।

আমার ইচ্ছে করলো ওকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে। ইচ্ছা করলো এই সিঁড়িতেই ওকে জোর করে ওর সব জামা কাপড় ছিঁড়ে নগ্ন করে রেপিস্টের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি।

রিনির পিছু-পিছু নামলাম সিঁড়ি দিয়ে। ওর নিতম্বটা ফাস্ট ক্লাশ, বলতেই হবে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আমি চোখ সরাতে পারলাম না।

গেটের বাইরে এসে একবার পেছন ফিরলাম। দোতলার জানালায় ফাঁকে খুঁজলাম, পেয়ে গেলাম। আমার প্রেম, আমার স্বপ্ন দাঁড়িয়ে আছে জানালার কাছে। আমাকে দেখছে। ঘুরে দাঁড়ালাম। রিনি বললো, 'তুমি ওটা নিয়ে আসো। আমি একটা রিকশা ঠিক করছি।'

নিঃশব্দে সামনের দিকে এগোলাম। বোতলের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ কনিয়াকের বোতলের ছাপ মারা সুন্দর একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়েছিলো শ্যালে থেকে। ব্যাগটা হাতে করে বাসা থেকে বেরিয়ে দেখি, রিনি রিকশা ঠিক করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছে যেতেই বললো, 'ওঠো।'

'কোথায়?'

'কোথায় মানে? রিকশায় ওঠো!'

'আমি যাবো না।' শান্ত কণ্ঠে বললাম।

'ধ্যাৎ, তুমি যে কি!' চট করে আমার একটা হাত ধরে বসলো

রিনি। টেনে রিকশায় ওঠালো। আমি বাধা দিলাম না। চলতে শুরু করলো রিকশা।

আমার বুকের ভেতর অসম্ভব কষ্ট হতে থাকে। রিনি চুপচাপ বসে থাকে আমার পাশে। ওর চুলগুলো বাতাসে ফুরফুর করে উড়ে এসে আমার চোখে মুখে লাগে। শ্যাম্পুর মিষ্টি ঘ্রাণ ভেসে আসে আমার নাকে। আমার ক্যানো জানি বারবার মনে হয়, আমার এ্যাতো কাছে এই মেয়েটি রিনি নয়, এখানে রিনির বসার কথা নয়—ও সনি। আমার প্রিয়া সনি।

গার্ডেন রোড থেকে বাঁক নিয়ে গ্রীন রোডে উঠলো রিকশা। আমার একটা হাত চেপে ধরলো রিনি। চোখেচোখে তাকালাম। রিনিকে আজ সত্যিই দারুণ লাগছে।

রিনি বললো. 'তুমি সেদিন আমার সঙ্গে মিথ্যে বললে ক্যানো?'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার, সেদিন রাত্রে, তুমি বললে তোমার নাকি অসুখ।' রিনি হাসছে।

আমি হঠাৎ করেই ভেঙ্গে পড়লাম ক্যানো। দু'হাতে রিনির হাতটা চেপে ধরলাম। 'রিনি, তুমি আমাকে বাঁচাও।'

অবাক হয়ে গ্যালো রিনি। 'কি বলছো।'

'আমি সনিকে ভালোবাসি, তুমি, প্লিজ, মাইণ্ড করো না।'

রিনির মুখটা ম্লান দেখালো। সামনের দিকে চেয়ে আছে।

'কিছু বলো, রিনি প্লিজ।'

'তুমি এ্যাতো ছোটো মেয়েদের সঙ্গে এসব করবে না,' শান্ত

স্বরে বললো রিনি।

'রিনি, তোমার কাছে আমি ওকে ভিক্ষা চাইছি। তুমি বাধা দিও না। কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে। ও আমাকে ভুল বুঝেছে। অপমান করেছে। তুমি মিটিয়ে দাও, তোমার হাতে ধরছি।'

'তুমি দেখছি এখনও বাচ্চাই রয়ে গেলে,' ঠোঁট উল্টে বললো রিনি।

আমি চুপচাপ বসে থাকি। সনির নিষ্পাপ মুখটা আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আমার বুকের ভেতর কান্নার বাষ্প জমাট বাঁধতে থাকে ইচ্ছে করে রিকশা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যাই। পালিয়ে যাই। কিন্তু আমি একজন পুরুষ। আমি একজন যুবক। একজন নারীর কাছে হেরে যাবো, তা হয় না। অমি নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করি।

রিনি আমার হাতটা চেপে ধরে রাখে। ধীরে ধীরে ওর হাতের মুঠো শক্ত হয়ে চেপে বসে আমার হাতে। এক সময় হাত ছেড়ে দিয়ে আমার চোখের দিকে তাকায় ও।

'কিন্তু আমিও যে তোমাকে ভালোবাসি।'

আমি চমকে উঠি। চেয়ে থাকি রিনির দিকে। রিনি মৃদু একটু হেসে বলে, 'তুমি এবার, প্লিজ একটু হাসো তো। গোমড়া মুখ দেখতে খুব খারাপ লাগে আমার।'

আমি নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করি। মনকে বলি, এসব কিছু না। জীবন একটা বিচিত্র অধ্যায়। একেক মানুষ একেক ধর-

ণের। কেউ ভালোবাসায় বিশ্বাস করে, কেউ করে না। কেউ দৈহিক সম্পর্কে বিশ্বাস করে, কেউ প্লাটনিক লাভ বিশ্বাস করে। সবাই এক রকম নয়। পৃথিবীটা বিচিত্র—মানুষও সেরকম। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। আমি একটা সিগারেট জ্বেলে পাফ করি। সনিকে ভুলে যেতে চেষ্টা করি। ভাবতে চেষ্টা করি—রিনিই আমার সব। অন্ততঃ এখন।

'এই তো তোমাকে খুব ভালো লাগছে এখন,' রিনি হাসতে থাকে।

খুব ছোটো থেকেই রিনিকে দেখে আসছি। খুব মর্ডান ও। আমাদের পাড়ার অনেক ছেলে ওর পেছনে ঘুরতো, কাউকে পাত্তা দিতো না। প্যান্ট-শার্ট পরতো। একা-একা বেরিয়ে পড়তো এখানে ওখানে। চুল রাখতো বয়-কাট।

একটা অত্যাধুনিক বাড়ির সামনে নামলাম আমরা। রিনি গেটের কলিং বেলের বোতামে চাপ দিলো। একটু পরে রিনির সম-বয়সী একটা মেয়ে ওয়াকিং ডোর খুলে দিলো।

'বল্‌লো, রিনি। মনিং!'

'মনিং!'

হ্যাণ্ডসেক না করে পরস্পরের হাতে ছোট্ট একটা চাঁটি মারলো ওরা। রিনি আমার দিকে ঘুরে বললো, 'আমার ফ্রেণ্ড, সিমুল। আর ও হচ্ছে আমার বান্ধবী বাবলী।'

ঠিক একই কায়দায় আমার হাতে ছোট্ট করে চাঁটি মারলো বাবলি। 'হাউ ডু ইউ ডু?'

'হাউ ডু ইউ ডু।' আমিও উত্তরে বললাম।

চেয়ে দেখলাম মেয়েটা শাদা শার্ট আর শাদা পেন্ট পড়েছে। পায়ে শাদা কেট্স। চেহারা অনেকটা সনির মতো। ইনোসেন্ট। একদম শিশুর মতো নিষ্পাপ। সহজ দৃষ্টি, কিছুটা উচ্ছল। আমার মনে হলো এই মেয়ের গায়ে আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষ হাত দ্যায়নি। আজ পর্যন্ত কোনো ছেলে ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখেনি।

'ফীল এ্যাট হোম, সিমুল,' আমার একটা হাত চেপে ধরে সামনে এগোলো বাবলি।

আমার হঠাৎ খুব ভালো লাগলো। আমি নিচু স্বরে বললাম, বাবলী, ইউ আর সো লাভলী।'

হেসে ফেললো বাবলী। 'ইউ'র, টু।'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। কয়েকটা রুমের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম একটা হল রুমের দিকে। বাড়িটা বিশাল কিন্তু ভেতরে কাউকে দেখলাম না।

হলরুমে দু'টো ছেলে আর একটা মেয়েকে দেখতে পেলাম। ওরা উঠে এলো। বাবলী পরিচয় করিয়ে দিলো সবার সঙ্গে।

একটা ছেলে, ক্লিন সেভ করা। খুব ম্যানলি চেহারা। ওর পরনেও সম্পূর্ণ শাদা পোশাক। নাম : ফয়সাল। আমার হাত ধরে অনেকক্ষণ ঝাঁকালো। তারপর মৃদু হেসে বললো, 'তোমাকে দেখতে ঠিক রকিব চৌধুরীর মতো মনে হয়।'

'রকিব চৌধুরী ওর বড় ভাই,' হেসে বললো রিনি। 'তুমি ঠিকই ধরেছো।'

'আই সি।' অবাক দেখালো ফয়সালকে। 'উনি কি এখনও টি, ভি-তে উপস্থাপনা করেন?'

'বছর খানেক হলো ছেড়ে দিয়েছেন। নিউজ উইকের চাকুরীটা পাওয়ার পর থেকেই।' বললাম।

অন্য ছেলেটার সঙ্গেও বাবলি আলাপ করিয়ে দিলো। এ ছেলে-টাকে দেখেই খুব ভালো লেগেছিলো আমার। লম্বা চুল, এলো মেলো। ঠোঁটে সিগ্রেট পুড়ছে। চোখে শান্ত দৃষ্টি। হাত বাড়িয়ে দিতেই বললো, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ। তুমি সিগ্রেট খাও?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আজ থেকে তুমি আমার ফ্রেণ্ড।' বেনসনের একটা প্যাকেট আমার হাতে ধরিয়ে দিলো ও। 'আমার নাম পুপুল, খেয়াল রেখো।'

আমি আন্তরিক ভাবে হেসে একটা সিগারেট ধরালাম পুপুল বললো, 'আরেকজন রয়ে গ্যাছে, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি,' এক হাতে কোমর জড়িয়ে লাজুক একটা মেয়েকে কাছে টেনে আনলো পুপুল। 'এর নাম এ্যালিস। আমার সুইট ডার্লিং।'

মেয়েটা হাত বাড়িয়ে দিলো। আমি অলস মুঠায় হাতটা চেপে ধরে বললাম, 'উইশ বোথ অব ইউ এ্যা লাভলী ফিউচার!'

মেয়েটা হাসলো একটু তারপর প্রেমিকের একটা হাত জড়িয়ে ধরে চেয়ে থাকলো আমার দিকে।

বাবলি বললো, 'চলো সবাই বসে-বসে আলাপ করি।'

হলরুমের মাঝখান জুড়ে বিশাল কার্পেট বিছানো। চারপাশে

সোফা। মাঝখানে গোল একটা টেবিল। হলরুমের একপাশে বড় একটা কমপেট্ ড্রিস্কে মিষ্টি মিউজিক বাজছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা বসে-বসে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপ হলো। একটা ছোট্ট কাজের মেয়ে এটা-সেটা সার্ভ করছিলো। বাবলি ওকে ডেকে বোতল দু'টো আনতে বললো। এ্যাতোক্ষণ ফ্রীজের মধ্যে ঠাণ্ডা হচ্ছিলো ওগুলো।

ফয়সাল আচমকা প্রশ্ন করলো, 'তুমি ড্রিঙ্ক করো?'

'হ্যাঁ। আর তুমি?'

'হার্ড লিকার খাইনি কখনও। মাঝে-মধ্যে বিয়ার খেয়েছি।'

'বাবলি?'

'জীবনে আজ প্রথম খাবো।'

'এ্যালিস?'

'নাহ্। আমার খুব ভয় করে।'

'আজকে ভয়টা কেটে যাবে,' হেসে বললাম।

'নো নো, প্লিজ, আই বেগ ইওর পার্ডন।'

পুপুল হেসে বললো, 'থাক, ও খাবে না। আলহাজ্বের মেয়ে ও। খেলে গুনাহ হবে।'

পুপুলের বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললো সবাই। লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করলো মেয়েটা।

আমি মড়মড় করে একটা ছিপি খুলে বোতলটা রিনির দিকে এগিয়ে দিলাম, 'ঢালো।'

'প্লিজ তুমিই ঢালো,' সঙ্কুচিত স্বরে বললো রিনি।

আমি হাসলাম। বোতলটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললাম, 'বরফ দরকার।'

বলতে হলো না। কাজের পিচ্চি মেয়েটা ছুটে গিয়ে একটা চিনা মাটির গামলায় ভরে বরফ নিয়ে এলো। সবাই বসে বসে দেখছে আমি কি করি। আমি বাবলির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমার ঘরে সফট্ ড্রিঙ্কস্ আছে?'

'সফট্ ড্রিঙ্কস?' অবাক দেখালো বাবলিকে।'

'আই মিন, কোল্ড ড্রিঙ্কস।'

'ওহ, শিওর শিওর।' কাজের মেয়েটার দিকে তাকালো বাবলি। 'এই, ফ্রীজ থেকে পেপসির একটা কেস নিয়ে আয় তো।'

'অতো না,' হাত নেড়ে বললাম। 'জাস্ট দু'বোতল।'

ছয়টা চক্‌চকে ক্রিস্টাল গ্লাস। পাঁচটায় বোতল থেকে কনিয়াক ঢেলে নিলাম। বাকি গ্লাসে পেপসি ঢেলে প্রথমেই এ্যালিসকে দিলাম।

'না-না, প্লিজ···।'

'তোমাকে ওয়াইন দেইনি। কোল্ড ড্রিঙ্কস্।'

সংকুচিত একটা হাত এসে গ্লাসসটা ধরলো। আমি হেসে বললাম, 'গুড।'

বাকি পাঁচটা কনিয়াকের গ্লাসে বরফের টুকরো দিলাম।

দুষ্টুমি করে বললাম, 'এক সঙ্গে সবাইকে টেবিল থেকে গ্লাস তুলতে হবে।'

ফয়সাল বললো, 'ও কে, আমি কাউন্ট করছি—ওয়ান···টু···থ্রী।'

গ্লাস তুলে নিলো সবাই। তারপর সবগুলো গ্লাস এক সঙ্গে পরস্পরের গায়ে বাড়ি খেলো।

'চিয়ার্স!'

গ্লাস হাতে নিয়ে সোফায় হেলান দিলাম। আমি কখনও চুমুক দিয়ে ওয়াইন খাইনি। কিন্তু বরফ দেয়ায় চুমুক দিয়ে খাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। র' খাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর নয় তবুও বরফ দিয়েছিলাম। বরফ গলে যেতেই গ্লাসটা কাত করে গলায় ঢেলে দিলাম।

রিনি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো। আমি গ্লাসটা আবার ভরে নিলাম। একটু একটু করে খাচ্ছে সবাই। সবার গ্লাসে এখন টলমল করছে কনিয়াক। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। পর মুহূর্তে এক নিঃশ্বাসে শূন্য করে ফেললাম গ্লাস।

একে একে সবার মুখের দিকে তাকালাম। ঠোঁটের কাছে গ্লাস ছুঁইয়ে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রয়েছিলো এ্যালিস। চোখাচোখি হতেই খুব মিষ্টি করে হাসলো। রিনির মুখের দিকে তাকালাম। প্রত্যেকটা চুমুকের পর তেতো ওষুধ গেলার মতো মুখটা বিকৃত হয়ে উঠছে ওর। বাবলি অনেকটা সহজ। চায়ের মতো ছোটো ছোটো চুমুক দিয়ে গ্লাসটা ইতিমধ্যে খালি করে ফেলেছে।

দু'রাউণ্ড শেষ করে পুপুল বললো, 'এক্সকিউজ মি, ফ্রেণ্ড, আমাকে উঠতে হচ্ছে।'

'চলে যাবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

এ্যালিসের দিকে ইঙ্গিত করলো পুপুল, 'ওকে পৌঁছে দিতে হবে

বাসায়। ও আবার ওর বাবার সঙ্গে লাঞ্চ না খেলে ওর বাবা অপেক্ষায় বসে থাকেন।'

খুব মিষ্টি একটা হাসি ফুটলো এ্যালিসের ঠোঁটে। ঘাড় কাত করে বললো, 'কিছু মনে করেন নি তো?'

'না-না।' আমিও হাসলাম। 'আবার দেখা হবে।'

পুপুল একটা কার্ড বের করে দিলো। 'রিঙ করো।'

এ্যালিস বললো, 'আমার নাম্বারটাও দাওনা ওকে।'

কার্ডটা ফেরৎ নিয়ে এ্যালিসের নম্বরটা লিখে দিলো পুপুল। হাত বাড়িয়ে বললো, 'তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। রিঙ করবে তো?'

'আজই করবো।'

'আমি খুব খুশী হবো তাহলে। সি ইউ।'

'বাই।'

দরোজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এলো পুপুল। 'তোমার কাছে সিগারেট আছে?'

'হ্যাঁ। দেবো?'

'না-না, তোমাকে দিতে এসেছি।' পকেট থেকে তাজা এক প্যাকেট বেনসন বের করে দিলো ও।

বাবলি বললো, 'পুপুল, আবার এসো। এ্যালিস, ওকে নিয়ে আসবি তুই, নইলে ওর মনেই থাকবে না আমাদের কথা।'

হাসলো পুপুল। 'ফয়সাল-সিমুল-রিনিঝিনি, বাই।'

ওরা চলে যেতেই বাবলি আমার দিকে ঝুঁকে এলো, 'সিমুল,

দ্যাখো তো আমার চোখ লাল দেখাচ্ছে কি-না?'

'কিছুটা।'

'ওতেই চলবে,' গড়িয়ে ফয়সালের গায়ে পড়লো বাবলি। 'হ্যাল্লো, ফয়সাল, নাউ আই'ম ড্রাঙ্ক।'

ফয়সাল একটা হাতে বাবলিকে জড়িয়ে সবার সামনেই ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো। আমি রিনির দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। এক টুকরো বরফ মুখে দিয়ে হাসছে রিনি।

'আর খাবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো রিনি। 'আমার মাথা ঘুরছে।'

ফয়সাল আর বাবলি উঠে দাঁড়ালো। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম ওদের দিকে। রিনি আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললো, 'লেট দেম গো।'

ধীরে-সুস্থে আরেক গ্লাস কনিয়াক ঢেলে নিলাম গ্লাসে। আমার বুকটা ব্যথায় অবশ হয়ে এলো। বাবলির চেহারাটা এ্যাতো ইনোসেন্ট। অথচ এখন আর ওকে সেরকম ভাবতে পারছি না। সনির মুখটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ওকে কি পাবো? গ্লাসটা এক নিঃশাসে শেষ করলাম।

রিনি উঠে দাঁড়ালো। 'তুমি একটু বসো। আমি রুমটা দেখে আসছি।'

'রুম?'

'হ্যাঁ। ফর বোথ অব আস।'

আমি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলাম রিনির দিকে। রিনির

কোমরটা আকর্ষণীয়। নিতম্বটা বেশ। দেখলেই লোভ হয় আমার। কিন্তু ওর ছোটো বোনকে ভালোবাসি আমি।

চলে গ্যালো রিনি। বিশাল হল রুমে একা বসে আছি। বাবলি আর ফায়লাল কোন রুমে? কি করছে ওরা? এ্যাতো ইনোসেন্ট চেহারা, অথচ ।

আমার বুকের ভেতর কষ্ট হতে থাকে। এই ছেলে মেয়েগুলো ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না। ভালো লাগলে হৃদয় নয়, নরম বিছানা আছে—এটাই এদের নীতি। এ্যালিস আর পুপুলও কি এ নীতিতেই বিশ্বাস করে? আর ভাবতে পারছি না। দেহজ ভালবাসাই ভালো। সেখানে শুধু আনন্দ, কষ্ট পেতে হয় না। প্রত্যাখ্যান হতে হয় না।

আমার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসে। মাথাটা ঝিমঝিম করে। একটু একটু ঘুরতে শুরু করে। হাত-পা শিথীল হয়ে আসে। কি করবো, ভেবে পাই না।

আরেক গ্লাস ঢেলে নিলাম। রিনি ফিরে এলো। গ্লাসটা মুখে তুলছি দেখেই দ্রুত বাধা দিয়ে বললো, 'আর খেও না। তুমি কি করছো এসব?'

আমি ওর কথায় কান না দিয়ে গ্লাসে চুমুক দেই। আমার হাত থেকে গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে যায় রিনি। আমি সোফার আর্মে দু'হাত রেখে তাতে মুখ লুকাই।

চোখ বুঁজতেই সারাটা পৃথিবী আমার চোখের সামনে চরকির মতো ঘুরতে শুরু করে। রিনি আমার মাথায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে

থাকে, 'সিমুল···সিমুল ।'

ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাই রিনির দিকে। রিনি আমার একটা হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করে।

মাথাটা ঝাঁকালাম দৃষ্টি কিছুটা পরিষ্কার হয়ে এলো। দেখলাম রিনি আমাকে ওর বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

আমি ক্লান্ত স্বরে বললাম, 'ছেড়ে দা-ও। ছেড়ে দা-ও।'

'খারাপ লাগছে তোমার ? লেবু খাবে ?'

'না

'চলো, তোমাকে রুমে নিয়ে যাই।'

'আমাকে মাফ করে দাও, রিনি। আমার বুকে কষ্ট, অনেক কষ্ট।'

'কিছু কষ্ট হবে না। চলো।'

'সনি···সনিকে আমি খুব ভালোবাসি !'

'ধ্যাৎ। তুমি যে কি। অতো ছোটো মেয়ের সঙ্গে কি পাগলামি আরাম্ভ করেছো !'

'বিশ্বাস করো,—বিশ্বাস করো, আমি ওকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি।'

'তুমি এখনও ভালোবাসায় বিশ্বাস করো ? এসব তো ওল্ড কালচার !'

'ওল্ড কালচার ! হোক, তবু আমি সনিকে চাই। তুমি যা চাও সব দেবো, তবু ওকে তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না।'

সনি হা-হা করে হাসতে লাগলো। 'বেশ তো, ওকে তুমি পাবে। এখন আমার সঙ্গে চলো।'

'কোথায় ?'

'জাহান্নামে !' বিরক্ত স্বরে ধমক মারলো রিনি। আমার হাত ধরে টেনে তুললো। আমি অনেকটা স্বপ্নের ঘোরে ওর পিছু-পিছু এগোলাম।

আমাকে নিয়ে একটা রুমে ঢুকলো রিনি। তারপর দরোজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললো, 'আমার কথা না শুনলে সব মাকে বলে দেবো।'

'না, রিনি, না,' হাত জোড় করলাম আমি। 'কাকিকে বলো না।'

'বলবো না। তুমি একটা গাধা! বাবলি আর ফয়সালকে দেখলে না? ওরা ওসব প্রেম-ট্রেম বিশ্বাস করে না। পছন্দের মিলন হলেই পরস্পরের চাহিদা মিটিয়ে নেয় ওরা। তুমি তো আরেকটু হলে ওদের সামনে আমার প্রেস্টিজটাই মাটি করে দিতে!'

আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি রিনির দিকে। টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে বসে পড়ি। রিনি একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় আমাকে। আমার মাথাটা আবার চক্কর দিতে থাকে। চোখের সামনে অনেকগুলো রিনিকে দেখতে পাই। শুয়ে থাকলে এক্ষুণি জ্ঞান হারাবো আমি। দম বন্ধ করে অনেক কষ্টে উঠে বসলাম। ভালো করে চোখ ডলে তাকালাম। কুয়াশা—ঘন কুয়াশায় ডুবে যাচ্ছে রিনি। আমি বিড় বিড় করে বললাম, 'লেবু দাও। আমাকে লেবু দাও।'

রিনি ছুটে গিয়ে লেবু নিয়ে এলো। লেবুর সঙ্গে বুদ্ধি করে লবন মাখিয়ে দিয়েছে ও। মুখে নিয়ে কয়েকবার চুষতেই হালকা হয়ে যায় আমার মাথাটা।

ছোট্ট বাচ্চার মতো আমাকে বুকে নিয়ে লেবুর রস খাইয়ে দেয় রিনি। আমি চেয়ে থাকি ওর চোখের দিকে।

'ভালো লাগছে?' জিজ্ঞেস করলো রিনি।

আমি মাথা নাড়লাম। তারপর উঠে বসলাম। অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। রিনি আমাকে আবার বুকে টেনে নিয়ে বললো, 'শুয়ে থাকো।'

আমি রিনির নরোম বুকে মুখ গুঁজে চুপচাপ পড়ে থাকি। রিনির বুকে পাগল করা মিষ্টি একটা ঘ্রাণ। আমি ওর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে ঘ্রাণ নেই। রিনি এক সময় আমার চিবুকটা তুলে ধরে। তারপর ধীরে ধীরে ওর ঠোঁট জোড়া পুরে দেয় আমার ঠোঁটের ফাঁকে।

সামান্য একটা ছোঁয়া। নরম, ভেজা। এতেই য্যানো আমার মাথাটা সম্পূর্ণ হালকা হয়ে যায়। আমি অলস একটা হাতে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরি। আমার ঠোঁট জোড়া শক্ত হয়ে চেপে বসে রিনির নরোম ঠোঁটে।

ধীরে ধীরে প্রাণ ফিরে আসে য্যানো আমার শরীরে। রিনি বেশিক্ষণ আমার শরীরের ভার ধরে রাখতে পারে না। দু'জনেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ি। আমি বাচ্চাদের মতো মুখে ওর নরোম স্তন জোড়া খুঁজতে থাকি। রিনি নিজেই ওর পোশাক খুলে ছুঁড়ে

ফেলে। ব্রেসিয়ারের হুকটা আমি খুলে ফেলি ওর।

রিনির বুকের ফর্সা নরোম একটা শালগম মুখে নিয়ে খেলতে থাকি আমি। আমার হাতে কখন প্রাণ ফিরে আসে জানি না। আমি আস্তে করে ওর স্কার্ট খুলে পা গলিয়ে বের করে ফেলি। বাকি থাকে একটা পেন্টি। সেটাও খুলে নেই। নষ্ট হয়ে যাবো আমি। সোনিয়ার বোনের কাছেই নষ্ট হবো। সোনিয়ার জন্য এই রিনীকেই আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আজ আর ফেরবো না, নিজে নষ্ট হয়ে গেছি। সোনিয়ার ভালবাসা যখন নেই, নিজে পবিত্র থাকার দরকার কি? কার জন্য পবিত্র থাকবো?

রিনির একটা ত্রস্ত হাত আমার শার্ট পেন্ট খুলতে ব্যস্ত হয়ে যায়।

এক সময় আমি আর রিনি দু'জনে নগ্ন হয়ে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকি। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ি পরস্পরের দিকে। আমার কঠিন বুকে চেপে ধরি রিনির নরম শরীর। ওর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়ে একটা হাত নিয়ে যায় নাভির কাছে। আমার হাতটা সহজেই খুঁজে নেয় ওর নাভির নিচের নরম এলাকাটা। কোমল উত্তাপ যেখানে।

রিনি আমার পৌরুষ হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। আমার মগজের কোষে কোষে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আমার কঠিন বাহু-বন্ধনে মোচড় খেতে থাকে রিনির কোমল শরীর।

আমার মুখে ভাষা ফিরে আসে। জিজ্ঞেস করি, 'এটাই কি তোমার প্রথম?'

হ্যাঁ, আমার প্রথম পুরুষ তুমি,' জড়ানো স্বরে বলে রিনি।

রিনিও আমার প্রথম নারী। আমার প্রথম পাপ। আমার শরীরের নিচে নারীর উত্তপ্ত কোমল শরীর। রিনি কোমর দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে আমার নিম্নাঙ্গে। আমি ওর কোমরের নিচ দিয়ে একটা হাত গলিয়ে দিয়ে টার্গেট স্থির করি। তারপর লক্ষ্য স্থলে পিস্টনের প্রান্ত স্থির করে চাপ দেই। তারপর

সামান্য একটু শুঙ্গিয়ে ওঠে রিনি। আমি পশু হয়ে যাই। সজোরে কোমরে চাপ দিয়ে মিশে যাই রিনির শরীরের সঙ্গে। ঠোঁটে, স্তনে আদর করি ওর। আমার গলা পেঁচিয়ে ধরে রিনি। চোখ বুঁজে সহ্য করে নেয় আমার আগ্রাসন।

আমি উঁচু-নিচু হতে থাকি ঢেউয়ের মতো। সেই সঙ্গে রিনি শরীরটা মোচড়াতে থাকে। আবেশে চোখ বুঁজে থাকে রিনি। আমার শক্ত কঠিন ঠোঁট ওর নরম ঠোঁটটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

নিঃশ্বাসের ঝড় বইতে থাকে দু'জনের। এক সময় রিনি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখে আর আমি পশুর মতো ওর শরীরটাকে পিষে ফেলার চেষ্টা করি।

দু'জনে এক সময় দু'জনকে জাপটে শক্ত করে ধরে রাখি। রিনি আমার গালে, কাঁধে পাগলের মতো কামড়াতে থাকে। তারপর এক সময় স্থির হয়ে যায়।

ক্লান্ত হয়ে পরস্পরের আলিঙ্গনের মধ্যে হাঁপাতে থাকি আমরা।

আমাদের বিছানাটা লণ্ড ভণ্ড হয়ে যায়। রিনি উঠে বসে বিছানা ঠিক করতে গিয়ে আমাকে বলে, 'দ্যাখো।'

চেয়ে দেখি বিছানাটা ভিজে শেষ।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলি আমরা।

এগারো

মাথার ওপর গনগণে সূর্য। আমি লনে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকি। রিনি রিকশা আনতে গ্যাছে। বাবলি আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো, 'আসবে।'

আমি মাথা নেড়ে ওকে আশ্বস্ত করি। পোশাক বদলে এসেছে বাবলি। নীল রঙের সালোয়ার কামিজ পরনে ওর। চেহারাটা অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। আমার আবারও মনে হলো এ মেয়ের গায়ে কোনো পুরুষ-স্পর্শ নেই। কোনো পুরুষ আজও ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখেনি। নিষ্পাপ,—এ্যাতো নিষ্পাপ চেহারা খুব কমই দেখেছি। সনির সঙ্গে এদিক দিয়ে বাবলির অদ্ভুত মিল। আমি বাবলির মুখের দিকে তাকিয়ে সনির চেহারাটা কল্পনা করার চেষ্টা করি। সনি আর বাবলির চেহারাটা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় য্যানো। আমার মাথাটা আবার ঘুরতে শুরু করে। ফেরার পথে হল রুম থেকে আরও এক গ্লাস কনিয়াক গিলে এসেছিলাম। সেটুকু আবার চোখে রঙ মাখাতে শুরু করেছে।

রিকশায় উঠে বসলাম রিনির সঙ্গে। রিনির চোখ দু'টো হালকা লাল। কিছুটা উদাস দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে আছে। আমি নিঃশব্দে

ওর একটা হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে চেপে ধরি। রিনি ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকায়। ওর দৃষ্টিটা আমাকে ভেদ করে অনেক দূরে চলে যায় য্যানো।

'রিনি ?'

'বলো

'আমি সনিকে খুব ভালোবাসি।'

রিনি চুপ করে থাকে। আমি ওর হাতে মৃদু চাপ দেই।

'আমি সনিকে পাবো ?'

এবারও কিছু বলে না রিনি। ওর চোখজোড়া পানিতে ভরে যায়। আমি নিঃশব্দে চেয়ে থাকি। ড্রিঙ্ক করলে মানুষ খুব আবেগ-প্রবণ হয়ে যায়। রিনিও হয়তো আবেগে কাঁদছে। রিকশা ধীরে ধীরে গ্রীন রোড ধরে এগিয়ে যায়।

এক সময় রিনি আমার কাঁধে মাথা নামিয়ে রেখে হু-হু করে কেঁদে ফেলে। 'তুমি সত্যিই খুব ভালো···আমিই খারাপ।'

আমি চুপ করে থাকি কিভাবে ওকে সান্ত্বনা দেবো বুঝে উঠতে পারি না।

রিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'আমি সনিকে বলেছিলাম তোমার সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্ক আছে, ইঙ্গিতে বুঝেয়েছিলাম। ও বুঝে নিয়েছে। আমি আরো বলেছিলাম—তুমিও আমাকে ভালোবাসো। এখন আমি কি করবো ? আমিই যে তোমার সর্বনাশ করেছি। আমি বুঝিনি তুমি ওকে এতো ভালোবাসো। আমি ভুল করেছি।'

আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি চোখে হঠাৎ ঘোর অন্ধকার

ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। বুকের ভেতর কলজেটা ছিঁড়ে নামিয়ে ফেলছে য্যানো কেউ।

কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরাই। রিনি তখনও কাঁদছে। দুপুর আড়াইটা। রিকশা থেকে নেমে রিনি সোজা বাসায় চলে গ্যালো।

ক্লান্ত, অবশ পা টেনে টেনে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। আমার ইচ্ছে করলো সিঁড়ির ধাপের ওপর শুয়ে পড়ি। সিঁড়ি দিয়ে ওপর থেকে দ্রুত কেউ নেমে আসছে। মাথা তুলে ওপর দিকে তাকাবার শক্তিও নেই যেন আমার। আমি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়ি। পরমুহূর্তে চমকে উঠে থর থর করে কাঁপতে থাকি। সনি। দাঁড়িয়ে আছে আমার মুখোমুখি।

'সনি?' অস্ফুট স্বরে ডাকি ওকে।

'উম।' খুব ছোটো করে ম্লান মুখে সাড়া দ্যায় সনি।

আমি কাঁপা স্বরে বলি, 'সব ভুল···সব ভুল···সনি।'

সনি দাঁড়ায় না। তরতর করে নেমে যায়। আমি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াই। সনি দ্রুত গেট দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি ক্লান্ত হয়ে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ি। ওপর থেকে আবার কেউ নেমে আসে। আমি অলস দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকাই।

সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস করে হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে ওঠে আমার। এখন আমি কি করি। আমি এখন তো আর পবিত্র নই। সব হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আগে তো ভালোই ছিলাম। রিনির কাছ থেকে বেঁচেই ছিলাম। সনি আমায় আঘাত করলো বলেই তো নিজেকে

নষ্ট করে ফেললাম। সনিরই যতো দোষ। ও আমাকে ভুল বুঝলো কেন? কিছু জিজ্ঞেস না করেই অপমান করলো কেন? আমাকে ভালোবাসা বাদ দিলো। আমার ভালবাসা পবিত্রই ছিলো। কিন্তু এখন এ মুখ নিয়ে আমি ওর সামনে দাঁড়াবো কি করে?

বাবা চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'গেট আউট। হারামখোর, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। বেরিয়ে যাও!'

আমি কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। সনিকে জানালায় উঁকি মারতে দেখি। ওর পেছনে রিনি আর জিনির মুখটাও অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

টলতে টলতে রাস্তায় বেরিয়ে আসি। চোখে কুয়াশা লেগে আছে আমার। নেশার ঘোরে একটা রিকশার সঙ্গে অল্পের জন্য ধাক্কা খাওয়া থেকে বেঁচে যাই।

এখন কোথায় যাবো? কার কাছে যাবো?

খুব ঘুম পাচ্ছে আমার খিদেয় চিনচিন করছে পেট। কিছু খেয়ে নিয়ে এখন ঘুমানো দরকার আমার। নইলে রাস্তায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবো।

বৃষ্টি হঠাৎ করেই থেমে গেলো। নিমেষেই রাস্তার জমা পানি উধাও হয়ে গেলো। আকাশ পরিস্কার ঝকঝকে। মাথাটাও অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

ডাবলুর কথা মনে পড়লো। এখন কোথায় পাবো ওকে? কামাল, তারেক, সবার মুখ ভেসে উঠলো। ওদের কারো বাসায়

যদি এখন একটু ঘুমোতে প'রতাম !

এলোমেলো পায়ে এগোলাম সামনে। সিগারেটের দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দোকান থেকে চেঁচিয়ে উঠলো হারামিটা, 'সিমুল, সেদিনের সিগারেটের দুই টাকা দিয়ে যা !'

স'রে করে ঘুরে দাঁড়ালাম। খুব শান্ত স্বরে বললাম, 'ভাংতি নেই, পরে নিস।'

'পরে কখন ?'

'কালকে '

'না-না, এখনই দে।'

'ভাঙতি নেই।'

'চাপা মারিস না, তোর কাছে টাকা থাকলে তো ভাংতি !'

খুব ধীরে পা ফেলে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার পকেটে তিন হাজার টাকা খস খস করছে। একটা পাঁচ শ' টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে দিলাম।

হকচকিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকলো দোকানদার ছোঁড়া।

'চার শ' আটানবয়ই টাকা ফেরত দে !' শান্ত স্বরে বললাম।

'ভাংতি নেই আমার কাছে।'

মাথায় খুন চেপে গেলো হঠাৎ। খপ করে ওর কলার ধরে এক টানে তুলে আনলাম দোকান থেকে। পরমুহূর্তে আমার প্রচণ্ড একটা ঘুষি খেয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়লো ও।

নোটটা তুলে নিয়ে হন-হন করে এগোতে চেষ্টা করলাম। খুঁজতে বেরোবো সবাইকে।

ডাবলু বাসায় নেই। কোথায় গ্যাছে, জানবে না ওর বাসার কেউ। এসময় ওর বাসায় থাকার কথা নয়।

কামাল কোথায় নাকি একটা ছেলেকে স্ট্যাব করেছে। এখন কোথায়, কেউ জানে না।

তারেককে বাসায় পেলেও, হেরোইন স্মোক করে মরার মতো পড়ে আছে। কয়েক বার ধাক্কা দিলেও নড়বে না।

অনুভব করছি আমার পা দুটো আপনা থেকেই ভাঁজ হতে চাইছে। চলতে চলতে যতদূর সম্ভব রাস্তার পাশ দিয়ে এগোচ্ছি। রাস্তাটা শুধু বাঁকা মনে হচ্ছে। তবুও এগোচ্ছি আমি। সামনে পথে রাখা একটা ইঁটে হোঁচট খেলাম। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি মাথায় পড়লো। আকাশের দিকে তাকালাম। অতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছতে পারলো না। তার আগেই আমার চোখ আটকে গেলো। জানালায় সনি। আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

তুমুল বৃষ্টি আরম্ভ হলো। দেহে এমন শক্তি নেই যে দৌড়ে গিয়ে নিজেকে একটা ছাদের নিচে রাখি। দুটো পা কাঁপছে। আর সবচে' যে ছাদটা আমার নিকটে সেটা আমার বাবার। যে লোকটা আমার বাপ সে একটু আগেই আমাকে বের করে দিয়েছে।

জানি সনি জানালায় দাঁড়িয়ে আমার জন্য কাঁদছে। চিৎকার করে ওকে সুইট হার্ট বলে চিৎকার করতে ইচ্ছা করলো। পারলাম না। ভিজে গেলাম এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে। জিনসের প্যান্টটা ভিজে ভারী বস্তার মতো হয়ে গেলো। শীত শীত লাগছে। দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে বাড়ি খাচ্ছে। আমার বিবেক, বোধশক্তি

সব হারিয়ে ফেলছি ক্রমে ক্রমে।

সোনিয়ার মুখটা বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে আমার সামনে মুক্তার মতো ঝকঝক করতে লাগলো। হু হু করে বুকের ভেতরটা আমার শূন্য হয়ে যেতে লাগলো। সোনি! বিশ্বাসঘাতিনী! তোমার সুন্দর মুখ দেখে আর কখনও যেন সুইট হার্ট বলতে না হয়। তোমার প্রেম বালির বাঁধ। এতো সামান্য ঝাপটা ও সহ্য করতে পারলে না?

অথচ দেখো তোমার সিমুলকে। মদ খেয়েছি। বাপের কাছে বকা সহ্য করেছি। বনের পাখিটাও যখন একটা ছায়া বেছে নিয়েছে তখন আমি বৃষ্টিতে ভিজছি।

মাথা ঘুরে-পড়ে যাচ্ছিলাম। দু'পাশে পানি জমেছে। আমি পানির উপর দাঁড়িয়ে। আমার দু'পাশ দিয়ে পানির মৃদু স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কোনমতে রাস্তার পাশের দেওয়ালটা ধরে বসে পড়লাম। কোমরের নিচু পর্যন্ত রাস্তার ময়লা পানিতে ডুবে গেলো। বৃষ্টি বাড়লো, সুচালো ফোঁটাগুলো চোখে বিঁধতে লাগলো। টলতে টলতেও দেওয়াল ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। শক্তি পেলাম না। এগোতে পারলাম না। পা দুটো যেনো অকেজো হয়ে গেছে। ও দুটো যেন নরম মোমের। শক্তিহীন।

একটা কবিতা আওড়ে ফেললাম—

সব কষ্ট বুকে নিয়ে,
এগিয়ে চলেছি আমি।
সব কান্না বাঁধ ভেঙ্গে,
এ ধরা ভিজিয়েছি আমি।

তবু আমি তোমার।
তবু তুমি আমার।
নাই বা পেলাম তোমায়,
থাকবে তুমি অন্তরে।

সামনের রাস্তাটা একটু ঢালু। পানি জমেছে মনে হচ্ছে আমি একটা সমুদ্রের সামনে বসে আছি। আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশটা ভাঙ্গা মনে হচ্ছে। দু'ফাঁক হয়ে রয়েছে। সেখানে আমি আর সোনিয়া। আকাশের ফাটাতে দাঁড়িয়ে আমরা দু-প্রেমিক প্রেমিকা।

বমি আসতে চাইছে। মাথা ঘুরছে। নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত উঠে আসতে চাইছে। খাওয়ার মাত্রাটা একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিলো। তার ওপর ঠাণ্ডা পেয়ে ধরে গেছে শালা।

'সিমুল ভাই, আপনাকে বাসায় নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে।'

সোনিয়াদের চাকরকে দেখে আনন্দে দু'চোখ আমার চকচক করে উঠলো। আমার সোনিয়া তার চাকরকে পাঠিয়েছে। আমার কষ্টে ওরও কষ্ট হচ্ছে? গর্বে বুকটা ভরে উঠলো। ফড়িং এর মতো পা দুটোও নাচতে চাইছে। আমার সোনিয়া তাহলে আজও আমাকে ভালবাসে?

'ধর ধর আমাকে ধর। আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। আমাকে ধরে ধরে নিয়ে চল।' দেহে শক্তি ফিরে পেলাম। ওকে না ধরেই তড়াক করে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। মাতালদের এই এক সুবিধা। সহজেই অনেক কিছু ভুলে যাই। 'কি বললো সোনিয়া?'

'সোনি'পা না রিনি'পা পাঠালো। আপনাকে…'

'শালা ভোঁদরের বাচ্চা, শালা ক্যাকটাসের বাচ্চা, শালা ড্রাগনের বাচচা, শালা…'

'একটাও চিনিনা সিমুল ভাই। বাংলাতে বলুন।'

'শালা শুয়োরের বাচ্চা।'

'সিমুল ভাই গালি দেন কেন?'

'শালা কথা বললে খুন করে ফেলবো।'

আমার লাল বর্ণের দুটো বিস্ফোরিত চোখ দেখে আর কিছু বলার সাহস হলো না ওর। পরমুহূর্তেই বুঝলাম, চাকরটির সঙ্গে এমন ব্যবহার করা ঠিক হচ্ছে না। হেসে বললাম, 'না বাবা গালি দেবো না। পরে চুমু দেবো। তুই বাবা এখন একটা রিকসা ঠিক করে দে।'

'যাবেন কোথায়?'

'তোর শশুর বাড়ী।'

রিক্সা এলো। আমাকে ধরে ধরে উঠিয়ে দিলো। রিকশা ওয়ালাকে সামনে চলতে বললাম। কিন্তু যাবো কোথায়? কার কাছে যাব?

হুডটা ফেলে রিকশাওয়ালা জিজ্ঞাসা করলো।

'কোথায় যাবেন।'

'সামনে চল।'

অনেক কষ্টে ইচ্ছাটা যেন করলাম। জানি, সোনিয়া রিনি দু' জনেই আমাকে ভালবাসে কিন্তু আসি একজনকে ভালবাসি—শুধু সোনিয়াকে।

আল-রাজী হোটেলে গিয়ে দাঁড়ালাম। খিদেয় চেঁ-চোঁ করছে পেট। খেতে খেতে-দি- প্লেট ভাত শে করে ফেললাম খাসীর মাংস দিয়ে।

বিল মি রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর দেখলাম আর হাঁটতে পারি ঘুম—অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে আমার। কিন্তু ঘুমোবো কোথায়? এ্যামব্যাসাডর হোটেলে উঠবো নাকি? হঠাৎ নীপা ভাবীর কথা মনে পড়ে গ্যালো। ওখানে যাবো।

ভাবতে ভাবতেই একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়লাম। একটা সিগারেট ধরালাম। খুব মিষ্টি লাগছে ধোঁয়া। টেনসনে থাকলে সিগারেট খুব মজা লাগে। আমি ঘন-ঘন পাফ্ করতে থাকি সিগারেটটা।

রিকশা চলতে শুরু করলো। ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগে আমার ঘর্মাক্ত শরীরে। ঘুমে দু'চোখ বুঁজে আসে আমার।

আজ সনির ষোলতম জন্মদিন। সনি একটা কার্ড দিয়েছিলো। কার্ডের ওপরে নীল রঙে লিখেছিলো, 'প্রিয় "সিমুল।"

আজ সনির জন্মদিন। আর আমার ব্যর্থতার দিন—কান্নার দিন। সিঁড়িতে বাবাকে দেখে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। মুখ থেকে ভুর-ভুর করে কনিয়াকের মিষ্টি ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছিলো সিঁড়ির বাতাসে। বাবার বুঝতে কষ্ট হয়নি, আমি মদ খেয়েছি।

গ্রীন রোড থেকে মিরপুর রোড। তারপর লালমাটিয়া পৌঁছে গ্যালো রিকশা। নীপা ভাবীর বাসার সামনে রিকশা থামাতে নির্দেশ করলাম।

'নীপা, আর ইউ এ্যাট হোম?'

'নীপা, মাই সুইট ম্যাডাম, আর ইউ এ্যাট হোম ?'

টিপে দিলাম কলিংবেলের বোতাম। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে এক-দুই গুণতে শুরু করলাম।

আমি কি দরোজার সামনে বসে পড়বো ? শরীরটা এ্যাতো দুর্বল লাগছে ক্যানো ?

সতের···আঠার···উনিশ ··বিশ···

দরোজাটা খুলছে না ক্যানো ? করছে কি ইয়াং মেয়েটা ?

একত্রিশ···বত্রিশ···তেত্রিশ···

নীপা যদি বাসায় না থাকে ? আমি শিওর হার্টফেল করবো তাহলে।

পঁাচ্চল্লিশ ছেচল্লিশ···

"ক্যাঁও···এ্যাঁও···অাঁ···অাঁ।" খুলে গ্যালো দরোজা। সামনেই স্লীম ফিগারের রূপসী মেয়েটা।

'আরে সিমুল। এসো এসো।'

'ম্যাডাম, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে···তোমার খাটে ঘুমোতে দেবে ?'

নীপা ভাবী খুব অবাক হয়ে যায়। ভ্রু কুঁচকে তাকায় আমার দিকে। তারপর আমার হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে, 'ব্যাপার কি ? কি হয়েছে তোমার ?'

'ঘুম ঘুম পাচ্ছে··· আই হ্যাভ হ্যাড ওয়াইন।'

সেকেণ্ড দু'য়েক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ম্যাডাম। তারপর হাত চেপে ধরে বলে, 'চলো, তুমি ঘুমোও আগে, পরে কথা বলবো।' ভাবীর চোখটা বুঝলাম ভিজে গেছে।

আমি টলতে টলতে ম্যাডামের পেছন পেছন এগোই। আমার নাকে মিষ্টি ঘ্রাণ ভেসে আসে। নারী মাত্রই সুবাস নাকি?

ছোট্ট একটা রুম। একটা সিঙ্গেল খাট। সুন্দর করে সাজানো। ম্যাডামের রুচীর প্রশংসা করতেই হয়। আমি খাটের ওপর ধপাস করে বসে পড়ি।

ফ্যানের সুইচ অন করে নীপা দ্রুত আমার জামাটা খুলে ফেলে। বালিশটা টেনে ঠিক করে দেয়।

আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে নীপা। একটানে কেটস্ খুলে ফেলে। মোজার বিশ্রী গন্ধ লাগে আমার নাকে। কিন্তু নীপা ওসব কেয়ার করে না। মোজা জোড়া টেনে খুলে ফেলে। তারপর আমাকে ধরে শুইয়ে দেয় বিছানায়।

আমি য্যানো হঠাৎ সীমাহীন মহাশূন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। এরপর আর কিছুই খেয়াল থাকে না আমার।

ঠাস্ করে শব্দ হলো। ঘুমের মধ্যেও শব্দটা শুনতে পেলাম। পরমুহূর্তে গাল জ্বলে উঠলো আমার। দড়াম করে পড়ে গেলাম। চোখ মেলে দেখি হাসছে ম্যাডাম।

মাথার চুল মুঠ করে ধরে আমাকে খাটে বসিয়ে চড় মেরেছিলো নীপা। তারপর ছেড়ে দিতেই দড়াম করে পড়ে গেছি আমি।

'কি ব্যাপার মারছো ক্যানো?'

'ওঠো, রাত এগারটা বাজছে।' রাগত স্বরে বললো ও।

উঠে বসলাম। ইতিমধ্যে অনেক ঘুমিয়েছি। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। শরীরের আড়মোড়া ভেঙ্গে বললাম, 'নীপা, আমার

সিগারেটের প্যাকেটটা দাও তো।'

'এক থাপ্পড়ে দাঁত ফেলে দেবো। ঘুম থেকে উঠেই সিগারেট যাও, বাথরুমে সব রেডি। গোসল করে ফ্যালো।'

আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকলাম মেয়েটার দিকে। এই মুহূর্তে ওকে আমার স্ত্রী ভাবতে খুব ভালো লাগছে। নীপা সালোয়ার-কামিজ পড়ে আছে। অল্পবয়সী কিশোরীর মতো লাগছে ওকে। চুলগুলো ছেড়ে দেয়া। কাঁধের ওপর দিয়ে দু'ভাগ হয়ে বুকের ওপর দিয়ে নেমে গ্যাছে কোমরের নিচে। এ্যাতো দীর্ঘ চুল খুব একটা দ্যাখা যায় না। ওড়নার কাজ চুল দিয়ে সারছে মেয়েটা।

আমি হেসে বললাম, 'নীপা তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।'

'ধন্যবাদ। তুমি যাও, গোসলটা সেরে ফেলো।'

'গোসলের দরকার কি? আমি বাসায় ফিরবো।'

'উহু তা হচ্ছে না। তোমার জন্যে সন্ধ্যা থেকে রান্না-বান্না করেছি নিজ হাতে। খেয়ে দেয়ে এখানেই ঘুমোবে তুমি।'

আমি আপত্তি করি না। আমি নিখোঁজ হয়ে যেতে চাই। নীপার বাসাটা আমার খুব পছন্দ হয়। ছোটো-খাটো একটা বাড়ি। আট দশটা রুম। বেশ কয়েকটাই ফাঁকা। এখানে থাকতে পারলেই আমার মজা হতো। কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে যাবে। যে ঘরে উথাল-পাতাল বয়সের একটা মেয়ে থাকে, সেখানে আমার মতো একটা বদমাসকে বিছুতেই রাখা যায় না। তবু আমি নীপাকে পুরো পরিস্থিতিটা খুলে বললাম। নীপা নিজ থেকেই খুশী হয়ে বললো, 'অসুবিধা কি? তুমি এখানে থাকলে খুব মজা হবে আমার।'

'কেউ কিছু ভাববে না তো?'

'ভাববার মতো লোক কোথায়? আমার মা ছাড়া আর কেউ নেই। উনি অসুস্থ। সারাদিন খাটেই পড়ে থাকেন। মাঝে মধ্যে একজন ডাক্তার আসেন, ব্যাস্।'

আমি চুলে লাঙ্গল চালাতে থাকি। এখানে থাকলে নীপাকে আমি সহ্য করতে পারবো না। আমি হয়ে গেছি নাম্বার ওয়ান নারী-খেকো বদমাস। আর নীপা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হারামী। দু'জনে অবশ্য জুটিটা ভালই মিলেছি। আমি ভাবতে ভাবতে হেসে ফেলি। আল্লাহ জোড়া মিলিয়েছেন ভালো। দু'জনেই ছ্যাঁকিস্ট।

নীপা ধমক মারে। 'হাসো ক্যানো? আমি সিরিয়াসলি বলছি।'

'আমিও।' হাসতে হাসতেই জবাব দিলাম।

'তাহলে তো কোনো সমস্যাই রইলো না। যাও, বাথরুমে যাও, পানি রেডি। সাবান, টুথ-ব্রাশ, পেস্ট, শেভার তোয়ালে সব আছে ওখানে।'

আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে যাই।

গোসল সেরে খেতে বসলাম। চমৎকার রান্না করেছে মেয়েটা। খাওয়া শেষ করে বেসিনে হাত ধুয়ে নিলাম।

'ফোন সেটটা কোন রুমে?' জিজ্ঞেস করলাম নীপাকে।

'ড্রইং রুমে। ক্যানো?'

'বাসায় ফোন করবো।'

'ঠিক আছে, কিন্তু কোথায় আছো বলবে না কেমন?'

'তা তো অবশ্যই।'

আমি জানি বাবা এখন টি, ভি রুমে। সাড়ে এগারোটার খবর না শুনে উঠবেন না। মা আমার নিশ্চয়ই কাঁদছেন। হয়তো ফোনের অপেক্ষায় বসে আছেন। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করলাম বাসার নাম্বারে। কিছুক্ষণ বাজার পর রিসিভার তোলার শব্দ হলো।

'হ্যালো, দিস ইজ রকিব চৌধুরী।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে রিসিভারের মাউথপিস জড়িয়ে ফেলে ভারী গলায় বললাম। 'সিমুল আছে?'

'না। কে বলছেন?'

'আমার নাম নিক্সন। খালাম্মা আছেন?'

ভাইয়া কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'দাঁড়ান, ডেকে দিচ্ছি।'

মিনিটখানেক পর মা'র গলা ভেসে এলো, 'শোনো, কে বলছো তুমি?'

রিসিভারের ওপর থেকে রুমালটা সরিয়ে বললাম, 'মা, আমি সিমুল। শোনো, তুমি এখন কথা বলার সময় আমার নামটা উচ্চারণ করো না। আমি চাই সবাই মনে করুক আমি একদম নিখোঁজ হয়ে গেছি। বাবা আমাকে বকেছে, একটা শিক্ষা দেয়া দরকার। মা, শোনো, আমি একটা বন্ধুর বাসায় খুব মৌজে আছি। ক'দিন বেড়াবো এখানে। তোমাকে ডেইলি তিনবার ফোন করবো। বেলা দশটা, দুপুর দুইটা আর রাত দশটায়। এই তিনটা সময় তুমি ফোনের কাছে থেকো। যদি কথা বলার সময় ধরা পড়ে যাও, তাহলে বলো যে সিমুলের বন্ধু নিক্সনের সঙ্গে কথা বলছো। বুঝেছো?'

'হ্যাঁ। তুই এভাবে বাইরে না থেকে চলে আয় বাবা।'

'আসবো তো। বললাম না, দু'চার দিন বেড়াবো।'

'তোর বাবা কিছু বলবে না। আমি সব ঠিক করে ফেলবো।'

'তুমি চুপটি করে বসে থাকো। কিছু বলো না।'

'খাওয়া দাওয়া করেছিস?'

'হ্যাঁ, মা চমৎকার খাওয়া এখানে।'

'এখানে কোথায়?'

'ধরে নাও আমার শ্বশুর বাড়ি। এখানেও তোমার একটা বউমা আছে। খুব চমৎকার রাঁধে। আমাকে খুব যত্ন করে। তুমি কোনো চিন্তা করো না।'

'তুই মদ খেতে গেলি ক্যানো?'

'ধুৎ। এক জা'গায় গিয়েছিলাম, বন্ধুরা রিকয়েস্ট করলো। তাছাড়া একদিন খেলে এ্যামন কিছু হয় না।'

'আর খাবি না এসব। তোর বাবা একদম পছন্দ করে না এগুলো।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, আর খাবো না। মা, শোনো, সনি এসেছিলো বিকেলে?'

'হ্যাঁ। আমাকে ধরে নিয়ে গ্যালো ওদের বাসায়।'

'তারপর?'

'খুব দুর্ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি গিফট করবো। শেষে রুকিবকে বলতেই একটা ওয়াটার কালার পেইন্টের বক্স এনে দিলো ছ'শ' টাকা দিয়ে।'

'আমার কথা জিজ্ঞেস করেনি ও ?'

'না।'

'ওর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়ে গ্যাছে, মা।'

'বেশ হয়েছে। তুই মদ খেতে যাস্ কোন আক্কেলে ?'

'থাক মা, ওসব কথা বাদ দাও। কাল আবার ফোন করবো।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে সোফায় বসে পড়লাম। নীপা একটা ভরা পানির গ্লাসে কফির মতো চুমুক দিতে দিতে রুমে ঢুকলো।

'কি খবর ?'

'ভালো।'

'আজ মন খারাপ করো ক্যানো ?'

'ভালো লাগছে না।'

'কাকে ? আমাকে ?'

আমি হাসলাম। 'তুমি খুব সুইট।'

'তুমি খুব সুইট।' ঠোঁট উল্টে আমাকে ব্যাঙ্গ করলো নীপা। আমি হাসতেই থাকলাম। নীপার কোমরটা খুব আকর্ষণীয়। নাচলে খুব মানাবে ওকে।

'তুমি ড্যান্স করতে জানো ?'

'শিখাই।'

'কি বললে ?'

'ড্যান্স শিখাই আমি।'

'সত্যি।'

'তোমার কি মনে হয় ?'

'একটু নাচবে, প্লিজ ?'

'সম্মানী দেবে তো ?'

'দেবো।'

হাত বাড়ালো নীপা। 'দাও।'

'এ্যাডভান্স চাও নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'কত দেবো ?'

'পাঁচ শ'।'

ব্যাক পকেটে হাত দিয়ে মানি ব্যাগটা টেনে বের করলাম। একটা পাঁচ শ' টাকার নোট বের করে টি টেবিলে পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলাম।

নোটটা তুলে নিলো নীপা। উল্টে পাল্টে দেখলো। তারপর বড় বড় করে বললো, 'জাল নয় তো ?'

'না

নোটটা ফিরিয়ে দিলো নীপা। একটু একটু করে পানি খাচ্ছে ও। আমি বললাম, 'নাচবে না ?'

নীপা ভ্রু তুললো। 'দেখতে চাও ?'

'হ্যাঁ।'

পাখা মেলা পরীর মতো হাত দুটো মেললো নীপা। ঢেউ তুললো দু'হাতে। আমি অবাক হয়ে গেলাম। নীপা যে সত্যিই নাচ জানে, বুঝে ফেললাম।

এক পাক ঘুরলো নীপা। ওর হাতের গ্লাসে তখনও অর্ধেক

পানি। আমার সামনে এলো। আমার মাথায় পানি ঢেলে দিলো একটু। তারপর হাসতে হাসতে বসে পড়লো আমার পাশে। একটা তোয়ালে নিয়ে সযত্নে মুছে দিলো আমার চুল।

আমি হাত বাড়িয়ে টেলিফোন সেটটা এনে কোলে রাখলাম। রিসিভার তুললাম। সনিকে ফোন করতে খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু ও কি আমার সঙ্গে কথা বলবে? ওর একটা বান্ধবী আছে। আফরিন। ওর নম্বরটাই ডায়াল করলাম।

'হ্যালো, আফরিন?'

'কে?'

'আমি সিমুল।'

'অ, সিমুল ভাই। কি ব্যাপার?' আফরিনের কণ্ঠটা মিষ্টি।

'আফরিন, তুমি কি সোনিয়াদের বাসায় গ্যাছো আজ?'

'হ্যাঁ।'

'সনি তোমাকে কিছু বলেছে?'

'কই না তো। কোন ব্যাপারে?' রিনিঝিনি কণ্ঠে বললো ও।

'তুমি জানো, ওকে আমি ভালোবাসি?'

'সত্যি? জানতাম না তো। কিন্তু আজ যে…।'

'আজ কি? বলো।'

'আজ দেখলাম ওর ফুফাতো ভাই সাইমনের সঙ্গে খুব আলাপ করছে সনি।'

আমি নিঃশব্দে হাসলাম। সাইমন ছেলেটা এক বছর ধরে ঘুরছে সনির পিছে। ওকে এ্যামনিতে সহ্য করতে পারে না সনি।

'তারপর ?'

'আমি দরোজার ফাঁক দিয়ে স্পাইয়িং করছিলাম। দেখলাম সনির হাতে চুড়ি পরাচ্ছে ও। পরে আমি জিজ্ঞেস করায় সনি বললো, 'সাইমনের সঙ্গে ওর এ্যাফেয়ার আছে।'

'সনি নিজে বলেছে ?'

'হ্যাঁ। তুমি বিশ্বাস করছো না ?'

আমি চুপ করে থাকলাম। আমার সারা শরীর থর থর করে কাঁপতে শুরু করলো। ভেবেছিলাম দু'একদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এভাবে আমার ভালোবাসার করুন পরিণতি হবে জানতাম না। রিসিভারটা রেখে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলাম।

নীপা বললো, 'কি হয়েছে ?'

'কিছু না।'

'মুখটা ওরকম হাঁড়ি করলে ক্যানো ?'

'ঘুম পাচ্ছে আমার।'

'চলো।'

উঠে দাঁড়ালাম। নীপার রুমের ভেতর দিয়ে আরেকটা রুমে ঢুকলাম। আমার জন্যে ঝাঁট দিয়ে রুমটা পরিষ্কার করে রেখেছে ও। ঝকঝকে খাট। ফোমের বিছানা, ধুসর রঙের চাদর বিছানো। মশারীটা আগেই ফেলে রেখেছিলো ও।

'গান শুনবে ?' জিজ্ঞেস করলো নীপা।

'না।'

"তাহলে ওঠো খাটে।'

ঢুকে পড়লাম মশারীর নিচে। লাইট নিভিয়ে দিলো নীপা। অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়লো রুমে। টুং টাং করে চুড়ির শব্দ হলো। পারফিউমের মিষ্টি গন্ধ নাকে ভেসে এলো। পরমুহূর্তে নীপাকে আবিষ্কার করলাম ঠিক আমার বুকের ওপর।

এখন আর এসব অবাক লাগে না আমার কাছে। নিউইয়র্ক ফেল মারবে এখনকার ঢাকার কাছে। এখানকার মেয়েরা এখন আর অবলা নয়।

আমার বুকে শোকের পাথর। নীপা হয়তো বুঝতে পেরেছে, তাই কিছু প্রশ্ন করছে না। নীপার কোমল শরীরটা আমার পুরুষ শরীরে মিশে যেতে থাকে। আমার ধীরে ধীরে মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে থাকে। নারী, তুমি মহামারী। আমি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে থাকি। নীপার যা খুশী, করুক। কিছু বলবো না। মেয়েদের ওপর শ্রদ্ধা হারাতে বসেছি।

নীপা কুনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের তালুতে মাথা রেখে ছোটো বাচ্চাদের মতো আমাকে বুকের কাছে টেনে আনে। আমি ওর নরোম বুকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকি। এক হাতে আমার মাথার চুলে আঙ্গুল চালাতে থাকে নীপা। আমার চোখে ঘুমের বদলে রক্ত উঠে আসে য্যানো। সব ক'টা হারামীর এক শেষ। এদের সঙ্গে প্রেমের ভূমিকা না নিয়ে রেপিস্টের ভূমিকা নেয়া উচিত।

আমি এক হাতে নীপার ঘাড়ের পেছনটা জড়িয়ে খুব কাছ থেকে অন্ধকারে চেয়ে থাকি ওর চোখে। নীপাও চেয়ে থাকে আমার

দিকে। আমি ওর ঠোঁটের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে যাই। নীপা নিজে থেকেই এগিয়ে আসে। আমি ওর নরম পাতলা ঠোঁটে শক্ত করে ঠোঁট চেপে ধরি। নীপার উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে ঝাপটা মারে আমার মুখে

আমার শরীরে রক্ত উত্তপ্ত হতে থাকে। আমি ওর সালোয়ারের গিটটা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে যাই। নীপা আচমকা আমার হাতটা ধরে ফেলে। তারপর কষে চড় মারে আমার গালে। আমি চোখে সরষে ফুল দেখি। খুব অবাক হয়ে যাই। নীপা আরো জোরে আরেকটা চড় কষে একই গালে।

আমি যন্ত্রণায় কাতরে উঠি, 'নীপা!'

'শুয়ে থাকো!' তীব্র স্বরে ধমক মারে নীপা।

'কি করছো তুমি?'

'তুমি কি করছো?'

'তুমি চাও না আমাকে?'

'চাই।'

'তাহলে?'

'একজন ভদ্র স্মার্ট ছেলেকে চাই আমি।'

'আমি কি খারাপ?'

'না।' আমার তোমার সম্পর্কের ভুল ব্যাখ্যা সবাই করতে পারে কিন্তু, তুমি নয়?

'তাহলে—?'

'কথা বলো না!' নীপা আমাকে আবার বুকে টেনে নেয়।

আমি ওর বুকে মুখ গুঁজে হু-হু করে কেঁদে ফেলি।

নীপা ধীরে ধীরে আমার চুলে হাত বুলাতে থাকে। আমার চোখে মুখে অসংখ্য চুমোর পরশ পাই। নীপা আমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। কিন্তু আমি সাড়া দিতে পারি না।

বেশি নয়, দু'মিনিট। এরপর নীপার ঠোঁট জোড়া ঠোঁটে তুলে নিয়ে আদর করি। নীপা আমার শরীরে সঙ্গে সেঁটে যায়। ওর বুকের নরম স্তনে ভরে যায় আমার শূন্য বুক। ছোট্ট বাচ্চাদের মতো নীপা জড়িয়ে ধরে রাখে আমাকে। আমি ওর চোখে, নাকে কানের নিচে ঠোঁট ছুঁইয়ে দেই। নীপা ধীরে ধীরে আমার চুলে আঙ্গুল চালাতে থাকে।

আমার ভেতরটা নীপার নিস্পৃহ নিরবতায় শীতল হয়ে যেতে থাকে। অসম্ভব ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে। আমি বুঝতে পারি না, নীপা কি চায়? আমার দু'চোখ বুঁজে আসে। ও খুব ভালো।

নীপার হাতটা স্থির হয়ে যায়। আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। লক্ষ্য করি নীপা আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুচ্ছে। ওর একটা পা আমার দু'পায়ের ফাঁকে। আমার শরীরটা আবার উত্তপ্ত হতে থাকে। কিন্তু না—, নীপা ভাবী আমাকে ভালোবাসে সত্য কিন্তু সেখানে কোন পাপ নেই, থাকতে পারে না। আমাদের দু'জনের সম্পর্ক এখনও ফুলের মতো পবিত্র। বা হাতের আঙ্গুল দাঁতের নিচে ফেলে জোরে কামড়ে ধরি। সারা শরীরে যন্ত্রণা ছড়িয়ে দেই। আমার ভেতরের পশুটা মারা যেতে থাকে। আবার ঘুমিয়ে পড়ি আমি।

বার

আটটার দিকে ঘুম ভাঙলো।

দেখি নীপা আমার ঘাড়ের পেছন দিয়ে হাত জড়িয়ে আমাকে বসিয়ে হাসছে। ওর পরনে শাড়ি। চুলগুলো ভেজা। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'রাগ করেছো?' জিজ্ঞেস করলো নীপা।

'না। তুমি দেবী।'

নীপা আমাকে টেনে বুকের কাছে নিলো। তারপর আমার কপালের দীর্ঘ চুলগুলো সরিয়ে চুমু খেলো। আমার ক্যানো জানি নীপাকে বড় বোনের মতো মনে হলো। এ আরেক রহস্য—নারী রহস্য। আমি সনিকেও বুঝলাম, রিনিকেও বুঝলাম কিন্তু নীপাকে এখনও বুঝতে পারলাম না। অথচ সমাজ ভুল বুঝবে।

নীপা আমার চুলগুলো নেড়ে দিতে দিতে বললো, 'ঘুম পাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ঘুমাও। আমি অফিসে যাচ্ছি। দুপুরে ফিরবো। বাসা থেকে বেশি দূরে কোথাও যেও না। আমি য্যানো এসেই

তোমাকে ঘরে দেখি। এক সাথে খাবো দু'জনে। ও কে?'

আমি বাচ্চাদের মতো মাথা নাড়লাম। নীপাও ঠিক বড় বোনের মতো আমার দু'কান ধরে টেনে দিয়ে বললো, 'গুড।'

পার্স খুললো নীপা। একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে বললো, 'এটা রাখো। সামনে ভালো রেষ্টুরেন্ট আছে, নাশতা খেয়ে নিও। যাই?'

'আচ্ছা।'

নীপা ঝুঁকে কপালে আর দু'গালে দুটো চুমু এঁকে দিয়ে চলে গ্যালো।

আমার মন অদ্ভুত একটা ভালো লাগার পরশে পরিষ্কার হয়ে গ্যালো। এ্যাতোক্ষণ ঘুম পাচ্ছিলো। এখন হঠাৎ মনে হলো আমার কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, ঘুমের নেশা নেই। নীপাভাবী আমার জীবনে আশিবাদ। আমি উঠে বাথরুমে ঢুকলাম।

হোটেল থেকে নাশতা সেরে ফিরে এলাম। টেলিফোন সেট নিয়ে রিঙ করলাম পুপুলকে। পাওয়া গ্যালো না। ''এ্যলিস ইন দ্যা ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডে'' এর এ্যলিসকে ফোন করলাম। ও কলেজে গ্যাছে। বাবলিকে রিঙ করলাম।

'হ্যালো?' মিষ্টি নারী কণ্ঠ।

'দিস ইজ সিমুল।'

'সিমুল! মাই ডিয়ার হার্ট কিলার, ক্যামন আছো?'

'সুইট-সুইট।'

হা হা করে হেসে উঠলো বাবলি। 'এই শোনো, তুমি ঠিক এগারটায় ধানমণ্ডি লেকের দক্ষিণ দিকের ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে থেকো। তোমাকে আমার দরকার।'

'আমারও।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, বাবলি, ইউ আর ভেরী লাভলী।'

'ইউ আর, টু।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরালাম। সনি চলে গ্যাছে। যাক। এখন আমি ফ্রী স্টাইলে প্রেম করবো। ভাবতে গিয়ে আমার বুকটা আবারও অবশ হয়ে এলো। ক্যানো এমন হয়? সনি তুমি কি? তুমি কে? তুমি কি একটা গোপন কষ্টের নাম? মনে রেখো, এক প্রেমিকা যার হারায় তার জীবনে আসে শত প্রেমিকা। ভালোবাসা পরিণত হয় বাষ্পে।

সনি মানে বুকের গোপন ব্যথা। সনি মানে নিষ্পাপ গোলাপ পাপড়ি। সনি মানে চেয়েও না পাওয়া। সনি মানে একটা ভুলের পরিণাম।

বাবলির সঙ্গে দ্যাখা করতে হবে। বাবলি সুন্দর। নিষ্পাপ। আমি বিশ্বাস করতে পারি না বাবলির ঠোঁটে কেউ ঠোঁট রেখেছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

আমার প্যান্ট শার্ট নোংরা হয়ে গ্যাছে। জিনসের যে প্যান্টটা পরে কাল সকালে রিনির সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, সেটার বাঁ পায়ের হাঁটুর কাছে অনেকটুকু ছেঁড়া। আমি তিনবার রিপু

করিয়েছি। রিপু করলেই আবার একটু ছিঁড়ে যায়। বুড়ো হয়ে গ্যাছে প্যান্টটা। তিন বছর আগে কিনেছিলাম। কিন্তু পেন্টের চেহারাটা [ছেঁড়া বাদে] এখনও অম্লান। জাস্ট ফেইড হয়ে গ্যাছে, আর কিছু না।

শার্টের সামনে পেটের বাঁ দিকে কাল হোটেলে ভাত খেতে গিয়ে ঝোল ফেলে দিয়েছিলাম, হলুদ দাগটা বিশ্রী দেখাচ্ছে। দাগের রঙটা সুন্দর—চমৎকার ঝকঝকে হলুদ। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায় ওটা ঝোলের দাগ। কারো শার্টে ঝোলের দাগ দেখলে পাবলিক লোকটাকে বাচ্চা বা ছাগল-পাগল মনে করে। ওই দাগের ইমেজই এটা। যার গায়ে পড়বে, তাকে বাচ্চা মনে হবে।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তা করলাম, নতুন একটা জামা আর প্যান্ট এক্ষুণি কিনে ফেলবো কি-না। কেনা যায়। পয়সা আছে আমার কাছে।

আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। নতুন জামা পরা মানে আনন্দ করা। যেমন ঈদের দিনে পাবলিক নতুন জামা কাপড় পরে। আমি তো আনন্দে নেই। এখন আমার দুঃসময়। বিরহ কাল। রিনি আমার সর্বনাশ করেছে। আমি সনিকে পেয়েও হারিয়েছি। সবাই একে একে হয়ে উঠছে রহস্যময়। আর বাবলি তুমি ?

বাবলি, তোমাকে জানতে যাবো তোমার কাছে।

আমার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আমার ইচ্ছে করে নষ্ট হয়ে যাই। প্যান্টটা ছেঁড়া, আরেকটু ছিঁড়ে ফেলি। বিশ্রী দ্যাখাবে ?

তাতে কি? সুন্দর রেখেও বা কি লাভ? কে দেখবে? ধুৎ। পেন্টের ছেঁড়া অংশে আঙুল ঢুকিয়ে একটা টান দিলাম, ফাঁক করে আরেকটু ছিঁড়ে গ্যালো শার্টটাও একটু ছিঁড়ে ফেলবো? খুব শক্ত যে? আমার মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি এলো সিগারেটের আগুন দিয়ে আমি চারটে ফুটো করে ফেললাম শার্টের বিভিন্ন অংশে।

এখন ক্যামন দেখাচ্ছে আমাকে? জেনে লাভ নেই। যামন খুশী, তেমন দেখাক। আমার বুকটা আবার টন টন করে ব্যাথা করতে শুরু করলো। আমার অতো কষ্ট হয় না অবশ্য, তবু মাঝে মাঝে বুক ভরে বাতাস নেয়ার পরও ক্যামন খালি খালি মনে হয় এই বুক। যেনো কোথাও একটা ফুটো হয়ে গ্যাছে ফুসফুসে। সেই পথে হু-হু করে খালি হয়ে যাচ্ছে বুক।

আমার খুব পিপাসা পায়। কিন্তু আশ্চর্য এই মাত্র হোটেল থেকে নাশতার পর চার গ্লাস পানি খেয়ে এসেছি।

আমি বুঝতে পারি অদ্ভুত একটা তৃষ্ণা এটা। এ পিপাসা পানি দিয়ে মেটানো যায় না। সনির ঠোঁটে যে সুধা ছটা পান করলেই মিটবে এই অশুভ পিপাসা। অথবা আরেকটা পানীয় এ্যালকোহল।

আমি হাঁটতে শুরু করলাম। ঘড়িতে সময় দশটা-দশ। এই তরুণী সকালে কোথাও পাওয়া যাবে না এ্যালকোহল। বারগুলো এসময় বন্ধ থাকে। কাওরান বাজারের আবগারী কান্ট্রি লিকার শপে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

আমি একটা 'বিকল্প' ট্যাক্সি খুঁজতে থাকি। কয়েকটাকে থামার ইঙ্গিত করি। কাছে আসলে দেখি যাত্রী ভরা। আমি প্রত্যেকবার একটা করে অপমান অনুভব করি। শেষমেষ পেয়ে যায় খালি একটা।

উঠে বসি। একটা সিগারেট ধরাই। কাওরান বাজারের উদ্দেশ্যে ছুটতে থাকে ট্যাক্সি। আমি চুপচাপ সিগারেট পাফ করে যাই।

তিন মিনিটে পৌঁছে যাই। এক শ' টাকায় দু'বোতল কিনে বেরিয়ে আসি। ঘোলা পানির মতো জিনিসটা। দেখতে খারাপ লাগে। ট্যাক্সির কাছে ফিরে আসি।

'কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করলো ড্রাইভার।

'আমি ধানমণ্ডি দক্ষিণ দিকে ব্রীজের ওপর নামবো। শোনো, তুমি এ্যামন ভাবে রাস্তা ঘুরিয়ে গাড়ি চালাবে যাতে ঠিক এগারোটায় আমি ব্রীজে পৌঁছি।'

ঘড়ি দেখলো ইয়াং ড্রাইভারটা। 'এখন সময় দশটা-বিশ। তার মানে, চল্লিশ মিনিট রাস্তায় ঘুরবেন আপনি।'

'হ্যাঁ। ঠিক ধরেছো।'

'ভাড়া বলবো?' হেসে জিজ্ঞেস করলো চালক।

'বলো।' সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বললাম।

'মোট তিন শ'।'

'ও কে চালাতে। শুরু করো।' উঠে বসলাম পেছনের সিটে।

এয়ারপোর্ট রোড ধরে ছুটলো গাড়ি। আমি একটা বোতলের

ছিপি খুলে গলায় ছেড়ে দিতে লাগলাম। গন্ধটা বাজে। কড়া ঝাঁঝে বুক জ্বলতে শুরু করলো। একবার থেমে গেলে এ জিনিস আমার আর মুখে দিয়ে ঢুকবে না। আমি ঢক্-ঢক্ করে পুরো বোতল শেষ করে ফেললাম।

বোতলটা নামিয়ে রাখতেই দম বন্ধ হয়ে এলো। তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট জ্বালিয়ে পাফ করলাম।

সামনের দিকে তাকিয়ে চালক বললো, 'স্যার, কাঁচ তুলে দ্যান।'

আমি খালি বোতলটা জানালা দিয়ে রাস্তার পাশে ছুঁড়ে মারলাম। ঝন-ঝন করে ভেঙ্গে যায় ওটা। ড্রাইভারটা হঠাৎ স্পীড বাড়িয়ে দ্যায়।

আমি কিছু বলি না। আমার মাথাটা হাওয়ায় ভাসতে শুরু করে য্যানো। ধীরে ধীরে একটা হালকা কুয়াশার চাদর নেমে আসে চোখের সামনে। হঠাৎ আমার মনে হয় য্যানো, সন্ধ্যা হয়ে গ্যাছে।

আগের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আরেকটা ধরাই। কাল থেকে চেইন স্মোকার হয়ে গেছি। পর পর সিগারেট ধরাচ্ছি। বিশেষ করে ড্রিঙ্ক করলে সিগারেটের স্বাদটাই বদলে যায় য্যানো। চমৎকার লাগে টানতে।

সংসদ ভবনের সম্মুখ দিয়ে ছুটতে থাকে গাড়ি। আমি দ্বিতীয় বোতলটা তুলে নিয়ে খেতে শুরু করি। আমার জীবনেও এ্যাতো ড্রিঙ্ক করিনি। প্রায় অর্ধেক শেষ করে ক্লান্ত হয়ে বোতলটা মুখ থেকে নামিয়ে নিলাম। গলার কাছ দিয়ে শার্টটা ভিজে গ্যালো

অনেকটুকু।

আমার হাত-পা কাঁপতে শুরু করলো। চোখে কুয়াশার পরিবর্তে তারাভরা আকাশ দেখতে পাচ্ছি।

ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকালাম জানালা পথে। মিরপুর রোড ধরে গাড়ি ছুটে চলেছে। এই বোতলটা রাস্তার পাশে ছুঁড়ে মারার শক্তি থাকে না আমার। আমি আস্তে করে জানালার ফাঁক দিয়ে বোতলটা ছেড়ে দিলাম। দেখলে দেখুক পাবলিক। বিকল্প ট্যাক্সিটা আধ বোতল মদ পেছন দিয়ে প্রসব করেছে।

'ধ্যাৎ! করেন কি এসব?' বিরক্ত স্বরে বলে ওঠে ড্রাইভার।

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। 'শাট—আপ!' চিৎকার করে উঠি আমি।

ভয়ে চুপসে যায় ড্রাইভার।

আমি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি লোকটার ঘাড়ের দিকে। স্টিয়ারিং হুইল ঘোরায় ড্রাইভার। আমি বাইরে তাকিয়ে চিনে উঠতে পারি না জা'গাটা। এটা কোন রোড? কোন এলাকা? আমি হঠাৎ ধাঁ-ধাঁর মধ্যে পড়ে যাই।

আরেকটা সিগারেট ধরাই। কিছুটা টেনশন ফীল করি। লোকটা যদি আমাকে এখন অচেনা কোনো জা'গায় নিয়ে কয়েকজন মিলে ধুমসে পিটায়, তাহলে?

হঠাৎ জা'গাটা চিনে ফেলি আমি। এটা ধানমণ্ডি এলাকা। ওই তো সামনেই ব্রীজ। ঘড়ি দেখলাম, এগারটা বাজতে ত্রিশ মিনিট বাকি। লোকটা ধানমণ্ডির হৃৎপিণ্ড ভেদ করে ঝিগাতলার

দিকে যেতে চায়। আমি পেছন থেকে বললাম, 'গাড়ি ঘোরাও।'

'জী ?'

'গাড়ি ঘুরিয়ে গার্ডেন রোড নিয়ে যাও।'

'গার্ডেন রোড ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, গার্ডেন রোড। গ্রীন সুপার মার্কেটের পশ্চিম দিকে।'

শর্টকাট একটা রাস্তা ঘুরে গাড়িটা ফিরিয়ে নেয় ড্রাইভার। আমি চমকে উঠি হঠাৎ। দু'আঙ্গুলের ফাঁক থেকে সিগারেটটা পড়ে যায় নিচে। আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছিলো। সিগারেটটা পায়ে মাড়িয়ে ফেলে নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাই।

পাঁচ মিনিটেই পৌঁছে যাই গার্ডেন রোড। আমি ড্রাইভারকে খুব আস্তে ড্রাইভ করতে বলি।

'সনি, হোয়ার আর ইউ, মাই সুইট হার্ট।' স্কুলে যায় নি তো ? আমি দূর থেকে ওদের ছাদটা দেখার চেষ্টা করি। ছাদটা শূন্য। কেউ নেই। আশপাশে কাউকেই দেখছি না।

ধীরে ধীরে গাড়িটা পৌঁছে যায় এয়ারপোর্ট রোড। আমার বুকটা আবার খালি হয়ে যেতে থাকে। আবার ফিরে আসে সেই কষ্ট।

'যেদিকে খুশী চালাও,' বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলি।

মাথাটা একটু একটু চক্কর দিতে শুরু করে। বমি-বমি ভাব প্রকট হয়ে ওঠে। সোজা হয়ে বসে পড়ি। ঠাণ্ডা বাতাস এসে চোখে মুখে ঝাপটা মারে। শরীরটা নিষ্প্রাণ হয়ে যেতে থাকে আমার।

ঠিক এগারটায় ধানমণ্ডি ব্রীজ পৌঁছে যাই। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে

ড্রাইভারের হাতে একটা সিগারেট দিয়ে বলি, 'কিছু মনে করো না।' মুহূর্তে লোকটার গোমড়া মুখে হাসি ফুটে যায়। আমি টলতে টলতে রেলিঙের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। নিচে লেকের পানি। লেকের চারপাশ ঘেঁষে অনেকগুলো মাছ ধরার নৌকা। দু'একটায় এরি মধ্যে কেউ কেউ ছিপ নিয়ে বকের মতো কুঁজো হয়ে বসে আছে।

বাবলি আসেনি এখনও। ঘড়ি দেখলাম; এগারটা বেজে পাঁচ মিনিট।

আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো এখানে? আমার যে বসে পড়তে ইচ্ছে করছে এক্ষুণি। বাবলি, তুমি কখন আসবে?

সাড়ে এগারোটা বাজে। বাবলি আসেনি। আমি দাঁড়িয়ে থাকি তবু। অনেকেই তো ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারে না। আমি ধীরে ধীরে হতাশ হয়ে যাই। আমার শরীরটা মদের ক্রিয়ায় দুর্বল হয়ে যায় ক্রমশঃ।

পৌনে বারটা বাজে। আমি হাঁটতে শুরু করি। আর আসবে না বাবলি। ও হয়তো আমাকে একটা ডজ দিলো। অথবা খুব সুক্ষ্ম উপায়ে অপমান করলো। আমি কি ওর প্রতি খুব লোভ দেখিয়েছিলাম? ও কি ওর তুলনায় আমাকে একদম বাজে ভাবে?

আমি ব্রীজ ছেড়ে পুবদিকে হাঁটতে থাকি। শরীরটা ঘামে ভিজে যায়। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছে একটা রিকশা খুঁজতে থাকি। এ সময় পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া একটা সিলভার

হোয়াইট রঙের নিশান ক'রে কাগজ পেছনে গিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে। থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরি আমি। গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে আমার দিকে তাকায় একটা ইয়াং মেয়ে। পর-মুহূর্তে আমি চিনতে পারি ওকে। এ্যালিস।

'এ্যালিস?'

'হ্যাঁ। তোমাকে নিয়ে যেতে পাঠালো বাবসি। ও খুব ব্যস্ত তাই আসতে পারেনি। দেরী হয়ে গ্যাছে খুব, নাহ?'

'অনেক দেরী হয়ে গ্যাছে।' আমি জড়ানো সুরে বলতে বলতে এগিয়ে যাই ওর গাড়ির কাছে।

ভেতর থেকে গেট খুলে দ্যায় এ্যালিস। আমি উঠে বসি ওর পাশে। মেয়েটা খুব লাজুক। চেহারাটা মিষ্টি। জিনসের প্যান্ট আর রঙচঙে একটা শার্ট পরেছে ও।

গাড়ি ছেড়ে দিলো এ্যালিস। ব্রীজ পেরিয়ে পশ্চিমে ছুটলো গাড়ি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'গ্রীন রোড যাবে না?'

'যাবো।'

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

'একটু ঘুরে আসি তোমাকে নিয়ে।'

আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাই ওর দিকে। রহস্যময় একটা হাসি লেপটে থাকে এ্যালিসের ঠোঁটে। ওর ঠোঁটটা খুব পাতলা। এ রকম ঠোঁট আমার খুব পছন্দ। কিন্তু মেয়েটা খুব ভদ্র আর লাজুক। ওকে নিয়ে খারাপ কিছু ভাবতে চাই না এ মুহূর্তে।

'বাবলি আসেনি ক্যানো ?'

'ওকে নিয়ে বাইরে গ্যাছে পুপুল। যাওয়ার সময় আমাকে বললো, তোমাকে গিয়ে ওর হয়ে যাতে দুঃখ প্রকাশ করি।'

'তুমি যাওনি ক্যানো ?'

'আমি ?' রাস্তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকালো এ্যালিস। 'তোমার কথা ভেবেই আমি যাইনি।'

'আমার কথা ভেবে ?'

'হ্যাঁ

আমি অবাক হয়ে তাকালাম এ্যালিসের দিকে। এ্যালিস চেয়ে থাকলো সামনের দিকে।

'এ্যাতো দেরী করে আসলে ক্যানো ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'প্রথমে উত্তর দিকের ব্রীজে গিয়েছিলাম। দেখি ওখানে তুমি নেই। পরে এখানে এসে তোমাকে পেলাম।'

একটা সিগারেট জ্বেলে বাইরে তাকালাম। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম পাশেই ক্রিসেন্ট লেক।

একটা গাছের ছায়ায় গাড়ি থামালো এ্যালিস। আশপাশে কেউ নেই। নির্জন একটা এলাকা। মাঝে মধ্যে অবশ্য দু'একটা গাড়ি আসা যাওয়া করছে।

গাড়িতেই চুপচাপ বসে থাকলো এ্যালিস। আমিও নামলাম না। এই ভর দুপুরে বেড়ানো অসম্ভব। এ্যালিস ওর পাশের জানালার মার্কারী গ্লাসটা তুলে দিয়ে আমার দিকে তাকালো, 'ওটাও তুলে দাও।'

আমি বললাম, 'থাক না খোলা। গরম লাগছে।'

এ্যালিস বিরক্তির স্বরে বললো, 'তুলে দাও তো!'

আমি তর্কে না গিয়ে তুলে দিলাম কাঁচটা। এ্যালিস আমার দিকে ফিরে বললো, 'সিগারেটটা ফেলো।'

এ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলাম গোটা সিগারেটটা।

'তুমি মদ খেয়েছো, তাই না?' জিজ্ঞেস করলো এ্যালিস।

'হ্যাঁ।'

'তোমার কোনো দুঃখ আছে?'

'জানি না।'

'বলতে হবে না, আমি বুঝেছি তুমি কোথাও দুঃখ পেয়েছো।'

'কি করে বুঝলে?'

'তোমার চেহারা আর বেশবাস দেখেই। শার্টটা নষ্ট করলে ক্যানো?'

'নষ্ট করতে ভালো লাগে।

'নষ্ট করার মধ্যেও একটা নেশা আছে তাই না?'

'হ্যাঁ। তুমি কি করে জানলে?'

'আমারও যে নষ্ট হতে ইচ্ছে করে।'

আমি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলাম এ্যালিসের দিকে। এ্যালিস আমার কাঁধে চাপ দিয়ে বললো, 'পেছনে সিটে গিয়ে বসি চলো। হুইলের জন্য নড়তে পারছি না এখানে।'

পেছনে গিয়ে বসলাম দু'জনে। এ্যালিস আচমকা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বসলো। আমার মাথায় খুন চেপে গ্যালো।

খুব ধীরে মেয়েটাকে কাছে টানলাম। চুমু খেলাম ওর নাকের পাশে। পরমুহূর্তে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলাম। এ্যালিসের শরীরটা নীপার মতো। হালকা পাতলা। এক হাতে ওর শার্টের বুকের কাছের বোতাম খুলে ফেললাম। ফর্সা দু'টো স্তন বেরিয়ে পড়লো। এ্যাতো মসৃণ আর সুন্দর শালগম আর দেখিনি। আমি হাতের মুঠোয় চেপে ধরলাম। নরম। কোমল উষ্ণতার ছোঁয়া পেলাম হাতে।

দীর্ঘ একটা চুমু খেয়ে বললাম, 'পুপুলকে ছেড়ে এখানে এলে ক্যানো?'

'ওর কথা বলো না,' অভিমানের সুরে বললো এ্যালিস। 'ও নিজে সব মেয়েদের সঙ্গে মেশে আর আমাকে সব সময় পবিত্র থাকতে বলে। আমার সম্মুখ দিয়ে বাবলিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, আর আমি চুপটি করে বসে থাকবো?'

আমি হাসলাম। সুযোগটা ভালই পেয়েছি। এ রকম জিনিস সামনে পেলে কে ছাড়ে? আমি ওর স্তনে মুখ নামিয়ে আদর করতে থাকি। খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি ঘষে দেই ওর মসৃণ শালগমে।

'আমাকেই প্রথম বেছে নিলে নাকি?'

'হ্যাঁ। আর কাকে পাবো?'

'গুড।' হেসে ফেললাম।

উত্তপ্ত হতে থাকলো আমার শরীর। এ্যালিসের শার্টটাই খুলে ফেললাম। পুরো শরীরটা বুকে নিয়ে ঠোঁটে ঠোঁটে আদর বিনিময় করতে লাগলাম। এ্যালিসের আজ প্রথম পাপ। ওর জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। আমি চাই এর মজাটা বুঝতে শিখুক মেয়েটা।

আমি ধীরে ধীরে উত্তেজিত করতে লাগলাম ওকে।

নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এলো এ্যালিসের। আমি ওর প্যাণ্টের চেইনটা আস্তে করে টেনে খুলে ফেললাম। বোতামটা খুলে দিতেই ঢিলে হয়ে গ্যালো প্যাণ্ট। ঠেলে হাঁটুর কাছে নামিয়ে দিলাম বাধাটা। ভেতরের পেণ্টিটাও নামিয়ে ফেললাম। মসৃণ উরুর মধ্যিখানে চমৎকার একটা এলাকা। আমি এলাকাটা হাতে নিয়ে কচলে দিতে লাগলাম। কেঁপে কেঁপে উঠলো এ্যালিসের লজ্জাবতী নরম শরীরটা।

আদর করতে করতে উত্তপ্ত করে ফেললাম ওকে। লক্ষ্য করলাম, ছটফট করছে ও। ফিসফিস করে বললাম, 'কি হলো?'

'প্লিজ, যা করবে একটু তাড়াতাড়ি করো, এটা রাস্তা!' অধৈর্য্য স্বরে বললো এ্যালিস।

আমি হেসে বললাম, 'কি করবো?'

'ধ্যাৎ!' বলে নিজেই এক হাতে আমার পেণ্টের চেইন খুলে ফেললো এ্যালিস।

আমি···বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম। ওর হাতের কোমল ছোঁয়া পেতেই ফুঁসে উঠলো য্যানো আমার···।

নিজে থেকেই আমার কোলে উঠে পড়লো 'লাজুক' মেয়েটা। আমার কোমরের দু'দিক দিয়ে দু পা রেখে সামনে ঝুঁকে এলো ও।

আমি বললাম, 'এভাবে নয়। তুমি বসো সিটে। তাহলে আরাম পাবে।'

বাধ্য মেয়ের মতো সঙ্গে সঙ্গে দু'পা দু'দিকে মেলে সিটে হেলান

দিলো এ্যালিস। আমি হাঁটু মুড়ে ওর দু'পায়ের ফাঁকে বসলাম। তারপর এগিয়ে দিলাম নিজেকে।

লক্ষ্য করলাম এ্যালিসের আমি দু'হাতে ওর কোমর ধরে নিজের কোলের দিকে টানলাম। এ্যালিস নিজেই ঠিক করে···।

আমি মৃদু চাপ দিলাম। কিন্তু সফল হলাম না। আরেকটু প্রেসার বাড়াতেই···। এ্যালিস আমাকে হেল্প করলো। নিজের কোমরটা আরেকটু সামনে ঠেলে দিলো। ঠিক একই সময়ে আমি চাপ বাড়ালাম। তারপর···

এ্যালিস আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো। আমি ওর মাখনের মতো কোমল কোমর পেঁচিয়ে ধরলাম। দু'জনেই এক সঙ্গে ধাক্কা দিলাম পরস্পরের কোমরে। সম্পূর্ণ মিশে গেলাম ওর শরীরের সঙ্গে। ঠোঁটে ঠোঁট নামিয়ে আনলাম আবার। আমি পিষে ফেলতে লাগলাম এ্যালিসের নগ্ন শরীর। কথা বলছে না এ্যালিস। আমার কোমরের প্রত্যেকটা চাপ চোখ বুঁজে গ্রহণ করছে ও। আমার ঠোঁট কামড়ে ধরছে মাঝে মধ্যে।

ওর শরীরটাকে থেঁতলে ফেলতে ইচ্ছে করে আমার। আমার এক হাত ওর নরম বুক দলে-কচলে নিষ্পেষণ করতে থাকে।

পাগল হয়ে আমার চুল ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করে এ্যালিস। শরীরটা মোচড় খেতে থাকে ওর। আমার পিঠে ওর তীক্ষ্ণ নখ বসে যায়। নখ দিয়ে পিঠের চামড়া খামচে তুলে ফেলতে চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে কামড়াতে শুরু করে এখানে ওখানে। একবার আমার কাঁধটা খুব জোরে কামড়ে দিলো ও।

এক সময় সব পাগলামি থামিয়ে দু'হাতে আমার কোমর নিজের দিকে টেনে ধরে এ্যালিস। এক সঙ্গে নিজের কোমরটা চেতিয়ে ধরে আমার দিকে।

আমি তিন-চার বার জোরে জোরে···দিয়ে তারপর সজোরে ঠেঁসে ধরি···ওর কোমল শরীরের ভেতরে কোথাও বিস্ফোরিত হয় আমার পৌরুষ।

আমি আর এ্যালিস শক্ত করে পরস্পরকে নিংড়ে ফেলতে চেষ্টা করি। দু'জনেই পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে যাই। আমাদের দু'টো শরীর এক হয়ে যায়।

দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে যাই আমরা, পৃথিবীর আদিম খেলা খেলতে গিয়ে।

তেরো

বিকেল তিনটা। খাঁ-খাঁ করছে চারিদিকে। এ্যালিস চলে গ্যাছে। আমার শরীরে এখনও ওর নরম দেহের ছোঁয়া লেগে আছে। আমি এ্যালিসকে দেখেছি আজ।

এ্যালিস চলে গ্যালো। অথচ আমার একটু মন খারাপ হলো না। আমি সনিকে পাইনি। কিন্তু রিনিকে পেয়েছি, এ্যালিসকে পেয়েছি। হয়তো বাবলিকে পাবো। কিন্তু তবু ক্যানো আমার বুকে পাথর চেপে থাকে? ক্যানো?

আমি বুঝি না এসব। তবে কি শরীর আর ভালোবাসা এক নয়? আমি শরীর পেয়েছি। নারী শরীর। যতক্ষণ পেরেছি উন্মত্ত হয়ে খেলেছি শরীরের খেলা। কিন্তু তবু ক্যানো বারবার সনি নামের এই ব্যথাটা অবশ করে ফেলে আমাকে?

আমি তীব্র রোদের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকি। কোথায় যাবো এখন? আমার কোথাও ফিরতে ইচ্ছে করে না। মাথাটা অসম্ভব ভারী মনে হয়।

উদ্দেশ্য হীন ভাবে হাঁটতে থাকি। আমার পা যেদিকে হাঁটতে

চায়, চলে যাবো। অনেকগুলো খালি রিকশা ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার ইচ্ছে করে না রিকশা নিতে। ইচ্ছে করে নিজেকে কষ্ট দেই। হাঁটি নিজেকে তীব্র রোদে পোড়াই।

আমার সব ব্যথার মাঝখানে আরেকটা নতুন ব্যথার জন্ম হয়। এ ব্যথাটা কিছুটা অন্য রকমের। বুকের নয়, বিবেকের। ক্যানো আমি এ্যালিস নামের এই 'মিষ্টি' লাজুক মেয়েটাকে নষ্ট করলাম?

বিবেকের কষ্ট আর বুকের কষ্ট সব একাকার হয়ে যেতে থাকে আমার। আমি কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরাই। হাঁটতে হাঁটতে নিজের সঙ্গে কথা বলতে থাকি—

: তুমি কে?

: আমি সিমুল। সিমুল চৌধুরী।

: কি করছো এখানে?

: কি করবো, ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি পথে পথে।

: তোমার বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করে না?

: না। বাসায় ফিরলে আমার বাবা রাগে ফেটে পড়বে।

: ক্যানো?

: কারণ আমি আজ মদ খেয়ে নেশায় চুর চুর হয়ে আছি।

: তাহলে অন্য কোথাও যাও।

: না। অন্য কোথায় যাবো? নীপার বাসায়? কিন্তু আমার যে কোথাও ফিরতে ইচ্ছে করে না।

: তুমি সনির সঙ্গে দ্যাখা করছো না ক্যানো?

: সনি অন্য ছেলেকে ভালোবাসে। আফরিন বলেছে আমাকে।

: তুমি ওকে বোঝাচ্ছ না ক্যানো ? এ্যামনও তো হতে পারে, অভিমান করে বসে আছে মেয়েটা।

: আমি ওকে ডেকেছিলাম। সনি দাঁড়ায়নি।

: ব্যাস, তুমি আর কিছু করলে না।

: কি করবো ? রিনি ওকে যা বলেছে, তাতে একটা বেশ্যা মেয়েও আর ভালবাসবে না আমাকে।

: রিনি মিথ্যে কিছু বলেছিলো ?

: যখন বলেছিলো, তখন মিথ্যেই ছিলো, সব অপবাদ।

: তারমানে ব্যাপারটা এখন সত্যি ?

: এখন সবই সত্যি। শুধু মিথ্যে হয়ে গ্যালো আমার স্বপ্ন, আমার ভালোবাসা। আর আমি নিজে।

: ওকে পেলে তুমি কি ভালো হয়ে যাবে ? মেয়ে আর মদ এসব ছাড়তে পারবে ?

: ওকে তো আর পাওয়া যাবে না। তবু যদি পাই, সত্যি, একদম ভালো হয়ে যাবো।

: তাহলে আবার চেষ্টা কর।

: লাভ নেই। একটা বেশ্যাও আর কাছে আসবে না আমার। আমি নোংরা ন্যাকড়ার মতো বাহুল্য হয়ে গেছি।

: এখন কোথায় যাচ্ছো ?

: জানি না।

: কি চাও তুমি এখন ?

: মদ। অনেক অনেক।

: তারপর ?

: পড়ে থাকবো কোথাও। রাস্তায়, আইল্যাণ্ডে, অথবা কোনো পার্কের বেঞ্চিতে।

: নীপার ওখানে যাচ্ছো না ক্যানো ?

: নীপাকে আমি বুঝতে পারি না। ও হয়তো আমাকে নিয়ে নিজের দুঃখ ভুলতে চায়। কাল রাতে আমাকে চুমু খেতে দিয়েও বেশি এগুতে দ্যায়নি। দু'বার চড় মেরেছে আমার মুখে।

: চড় মারলো ক্যানো ?

: আমাকে সাবধান করে দিলো, যাতে ওর সঙ্গে সামলে চলি।

: চুমু খেতে দিলো ক্যানো তাহলে ?

: জানি না, হয়তো আমার দুঃখটা প্রশমিত করতে চেয়েছিলো। এর আগের দিনও চুমু খেয়েছিলাম। কিছু বলেনি। ও হয়তো বলতে চায়, আমি যে ওকে পছন্দ করি সেটা বোঝানোর জন্যে চুমুই যথেষ্ট। সকালে দেখলাম ঠিক বড় বোনের মতো আমাকে আদর করছে ও। আমি কি ভাববো ওকে, প্রেমিকা, ভাবী না বোন ? কোনটা ?

: তুমি ফার্মগেটের দিকে কোথায় যাচ্ছো ?

: আমি 'শ্যালে বার'এ যাবো। মদ খাবো আবার।

: মদ খেলে তো তোমার খুব ঘুম পায়, তখন কোথায় যাবে ?

: জানি না। হয়তো নীপার কাছেই ফিরে যাবো।

: তারচে' ভালো তুমি আমেরিকাতে চলে যাও। তোমার টোফেল আছে। আই টুয়েন্টি আছে।

: কিন্তু···

: কোন কিন্তু নেই, বাঁচতে চাইলে এদেশ ছেড়ে পালাও।

: কিন্তু স্কুলের নামে ডি ডি করতে হবে আশি হাজার টাকা।

: সেটাই চেষ্টা করো, তবুও সোনিয়াদের নিঃশ্বাসের আড়ালে চলে যাও।

: না আমি সোনিয়ার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া না করে যাবো না।

চার পেগ হাণ্ড্রেড পাইপার্স খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। গ্রীন রোড। এয়ারকণ্ডিশন্ড রুম ছেড়ে এসেছি। রাস্তায় গরম হাওয়ার মধ্যে আমার দম বন্ধ হয়ে এলো।

হাঁটতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পা জোড়া নড়তে চাইছে না। আবার রঙ ধরেছে আমার চোখে। আবার পা বাড়ালাম। দুলে উঠলো আমার অবশ শরীর। টলতে টলতে একটা খালি রিকশার দিকে এগোলাম।

'এ্যাই খালি ?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো রিকশাঅলা।

'আমি বাসায় যাবো।'

'বাসায় যাইবেন ? কোনহানে আপনের বাসা ?'

থতমত খেয়ে রিকশাঅলার মুখের দিকে চেয়ে থাকি আমি। সত্যিই তো কোথায় আমার বাসা ? নিজের অজান্তেই মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে যায়, 'গার্ডেন রোড।'

দু'চোখ গাঢ় কুয়াশা নিয়ে রিকশায় উঠে বসি। আমার অনিচ্ছা

সত্ত্বেও গার্ডেন রোডের গলিতে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ি। দু' মিনিটে পৌঁছে যাই।

নিজেকে জিজ্ঞেস করি : সোনিয়াকে বাসায় পাবো ?

হয়তো পাবো। হয়তো পাবো না। অবশ্য এসময় বাসাতেই থাকে ও।

: তুমি ওদের বাসায় যাবে ?

: হ্যাঁ। ওকে আমার দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। ওর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

: ওর কাছে গিয়ে লাভ কি ? ও তো আরেকটা ছেলেকে ভালোবাসে।

: আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। বিশ্বাস করতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আফরিন'র কথা ভুলও হতে পারে।

আমি সনিদের বাসার গেট দিয়ে ঢুকে পড়লাম। এবং চমকে উঠলাম। সামনেই আফরিন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। আমাকে দেখে মুখটা বিবর্ণ হয়ে গ্যালো ওর।

'আফরিন ?'

'হ্যাঁ। কোথায় যাচ্ছ তুমি ?'

'সনির কাছে। বাসায় নেই ও।'

আফরিন চুপ করে থাকলো। দৃষ্টিটা চঞ্চল হয়ে উঠলো ওর।

'সনি বাসায় নেই ?'

'আছে। যাও।'

'কে কে আছে ওদের বাসায় ?'

'ওদের বাসায় ?' অন্যমনস্ক স্বরে জিজ্ঞেস করলো আফরিন। চেয়ে থাকলো অন্যদিকে।

'হ্যাঁ।'

'কেউ নেই। সবাই পুণিমা হলে 'একান্ত আপনজন' ছবিটা দেখতে···গ্যাছে।'

'সনি যায়নি ?'

'না। বাড়িটা পাহারা দিচ্ছে ও।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটলাম। উঠে এলাম দোতলায়। দরোজা বন্ধ। ধীরে ধীরে মোচড় দিলাম নবে। নিঃশব্দে হা হয়ে গ্যালো দরোজা। কাউকে দ্যাখা গ্যালো না ভেতরে। একটা শব্দও হচ্ছে না কোনো রুমে।

ধীরে পদক্ষেপ ফেলে এগোলাম সনির রুমের দিকে। আমার বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগলো। পা জোড়া অবশ হয়ে এলো। ক্লান্ত মনে হলো নিজেকে। আমাকে হঠাৎ দেখে চমকে উঠবে না তো সনি ? কি করবে ও ? ছুটে পালিয়ে যাবে ? আমি ছাড়বো না ওকে। সব খুলে বলবো ওকে। সব বলবো। ক্ষমা চাইবো। বোঝাবো। ওকে আমার চাই-ই।

সনি নিষ্পাপ। সনি সুন্দর। সহজ। চঞ্চল হরিনী। রিনি'র মতো নয় ও। প্রেমে বিশ্বাস করে সনি। ওকেই আমার দরকার।

নিঃশব্দে সনির রুমের বন্ধ দরোজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভেতরে খুটখাট করে শব্দ হচ্ছে। আমার বুকের কল্পনটা দুপদাপ্ করে আরো বেড়ে গ্যালো।

দম বন্ধ করে ফেললাম। নবের গোল অংশ মুঠোয় ধরলাম। মুচড়ে দিলাম তারপর।

হা হয়ে গ্যালো দরোজা। ভেতরে কেউ নেই। দরোজা মুখে থমকে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার বুভুক্ষ চোখ জোড়া চঞ্চল হয়ে উঠলো।

তারপর হঠাৎ দেখলাম।

খাট ফুঁড়ে সিধে হয়ে বসলো একটা মূর্তি। সাইমন। পাশে সনি। একান্ত আপন ভঙ্গিমায়। এখনও গায়ে গা মিশে আছে দু'জনের।

একটা ভয়াবহ চিৎকার বেরিয়ে এলো আমার বুকের গভীর থেকে। আমি ছিটকে দরোজার কপাটে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়লাম ফ্লোরে। আমার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। থর থর করে কাঁপতে লাগলো সারা শরীর। গুলি খাওয়া পশুর মতো কাতরাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়ালাম। আমার কপাল গড়িয়ে উষ্ণ ঘন কিছু তরল পদার্থ নেমে এলো। হাত দিয়ে মুছতে গিয়ে দেখি রক্ত। দরোজায় বাড়ি খেয়ে মাথা ফেটে গ্যাছে আমার।

আমি ছুটতে শুরু করলাম। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে।

সনিদের গেটের সামনে দেখলাম, মা আর বড় ভাইয়া দাঁড়িয়ে আছে। পাগলের মতো ছুটে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম। পেছন থেকে ভাইয়া খপ করে ধরে ফেললো আমাকে।

মা ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরলেন আমাকে। আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম। 'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও আমাকে!'

'কি হয়েছে? মাথা ফাটলো কি করে?' মা বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করতে থাকেন। তাঁর কণ্ঠে কান্না।

'ম—দ, মা, আমি মদ খেয়েছি!' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

মা জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। আমি মায়ের বুকে ছোট্ট বাচ্চাদের মতো মুখ লুকিয়ে হু-হু করে কাঁদতে লাগলাম।

চোদ্দ

ভোর তখনও হয়নি।

রাতে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়েই ঘুমিয়েছিলাম। মগজের নেশা আর দেহের ক্লান্তিতে মায়ের আঁচল আঁকড়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। ঘুম ভাঙ্গতে দেখি মা নামাজ পাটিতে। অনেকক্ষণ ধরে নামাজ পড়বে। জানালা দিয়ে ঘরে সূর্য না ঢোকা পর্যন্ত মা উঠবে না। বালিশের তলায় হাত দিয়ে শোয়া আমার অনেক দিনের অভ্যাস। হাতটা একটু ভেতরে ঢুকতেই ধাতব পদার্থের স্পর্শ পেলাম।

চাবি। আলমারির চাবির গোছা। হাতে স্বর্গ পেলাম। জানি, বাবার কালোটাকা ভর্তি আলমারী। মাথায় বুদ্ধি খেললো। আমাকে পালাতে হবে। দূরে অনেক দূরে। সোনির বিষ নিশ্বাস থেকে মুক্তি পেতে হবে। আমেরিকা চলে যাবো। আই টুয়েনটি তো আছেই। স্কুলের নামে এক কোয়াটারের বেতন সমান প্রায় লক্ষ টাকা ডি, ডি, করতে হবে। তারপর টিকিট করতে হবে। রিটার্ন টিকিট লাগবে না। তবুও সতের হাজার টাকার ঝামেলা। ক্যাশ কমপক্ষে হাজার দু'য়েক ডলার পাশপোর্টে এনডোর্স

করতে হবে। মোটামুটি দেড় লক্ষ টাকা অথবা সোয়ালক্ষ টাকা হলেই চলবে। মোক্ষম সুযোগ। কৃপণ বাবাকে ছ্যাঁক দেওয়ার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।

উঠে পড়লাম। চাবিটা নিয়ে পা টিপে টিপে আলমারির দিকে এগোলাম। এসময় এবাড়ীতে মা ছাড়া কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। তবুও সাবধানে চারপাশটা চোখ বুলালাম। না কেউ নেই। দ্রুত আলমারিতে চাবি ঘোরালাম। মৃদু ক্যাঁচ শব্দ তুলে খুলে গেলো। পাচশ' টাকার ব্যাণ্ডিল তিনটে মুহূর্তের মধ্যেই আণ্ডার ওয়ারের মধ্যে চালান করে দিলাম।

আলমারি বন্ধ করে বিছানায় ফিরে এলাম। ষ্টাডিরুম থেকে পাসপোর্টটাও সঙ্গে নিলাম। বালিশের তলায় চাবিটা রেখে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। বাড়ী ছেড়ে চলে বের হলাম। এই প্রথম চুরি করে বাসা থেকে পালিয়ে যাচ্ছি আমি। কষ্ট অনুভব করলাম মায়ের জন্য। বাবা হয়তো সব ঝাল মায়ের ওপর ঝাড়বেন। তবুও আমার কিছু করার নেই। আমাকে পালাতেই হবে, নাহলে বাঁচবো না আমি।

হোটেলে নাস্তা সেরে পথে পথে অনেকক্ষণ হাঁটলাম। আমার এই দেশ। এই আমার মাতৃভূমি। সোনির জন্য এদেশকে ছাড়তে হচ্ছে। সোনি আমার জীবনের অভিশাপ।

ব্যাংকে গিয়ে প্রথমেই স্কুলের নামে আশি হাজার টাকার ডি ডি বানালাম। তারপর বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়ে অনুমতি নিলাম। আরো দু'হাজার ডলার পাসপোর্টে এনডোর্স করালাম। এতোসব

ঝামেলা পোহাতে পোহাতে দুপুর হয়ে গেলো। সেদিন আর ভিসা অফিসে যাওয়া হলো না।

আজ রাতে নীপা ভাবীর বাসায় যেতে ইচ্ছা করলো না। এমব্যাসাডর হোটেলে রাত কাটালাম। নীপা ভাবীর বাসা থেকে ভোর রাতে মতিঝিল যেতে অসুবিধা হবে। খুব ভোরে বারিধারা পৌছালাম। আই টুয়েন্টি, পাসপোর্ট, ডি, ডি, ভিসা ফর্ম সবই সাথে নিলাম। কিন্তু ওখানে গিয়ে লাইন দেখে মাথা ঘুরে গেলো। জমা-ই দেওয়া যাবে না। একশ' টাকা দিয়ে লাইন কিনলাম।

ইন্টারভিউ হলো। জিজ্ঞাসা করলো আমি কেন যেতে চাচ্ছি? বললাম—পড়াশুনা করতে।

'তুমি ওখানে থাকতে যাচ্ছো, চাকুরী করতে।'

কথাটা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো, ভেবেছি কি? রাগে উত্তর করলাম। দ্যাখো ভদ্রলোক, আমার বাপের ব্লাকমানিতে আমি নিজেও ডুবে থাকতে পারি। তোমার দেশে কেন এদেশেও আমার চাকুরীর দরকার নেই।'

পাসপোর্ট রেখে দিলো। বিকেল তিনটের সময় পিক-আপ করতে বললো।

সারা দুপুর মতিঝিলের বিভিন্ন অফিসের বারান্দায় বারান্দায় ঘুরলাম। কিছু খেতেও ইচ্ছা হলো না। শুধু মনে এক চিন্তা, তিনটের সময় ভিসা হবে কি-না?' দু'টো থেকে বারিধারা ঘোরাফেরা করলাম। তিনটের সময় ভিসা অফিসে ঢুকলাম।

ভিসা হয়ে গেছে।

মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। বের হয়ে সারা শহরে ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করলো। ছুটতে ছুটতে একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে গেলাম। পনের দিনের মধ্যে কোন টিকিট নেই। তবে পরশু দিনের পরের দিন কুয়েত এয়ার লাইন্সের একটা ফ্লাইট লণ্ডন হয়ে নিউইয়ার্ক যাবে। একটা টিকিট অন চান্স আছে। সেটা পরশু দিন কনফার্ম করতে পারবে। টাকা দিয়ে অন চান্স টিকিটটাতে চান্স নিয়ে চলে এলাম।

সন্ধ্যা নেমেছে। দুর্গাপূজার ছুটি কালকে। সারা শহর আনন্দ-মুখর। আলোক শয্যা করা হয়েছে মোড়ে মোড়ে। মা দুর্গা অনেক আলোর মাঝে তার দশ হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেক হিন্দু ছেলে মেয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

হাঁটতে হাঁটতে গুলিস্তানের সামনে রুচিতাতে ঢুকলাম। অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে মদ খেলাম। আজ মদ খেতে অন্যদিনের চেয়ে বেশী ভালো লাগছে। আজ মনে হচ্ছে, রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত আমি। সোনিয়া তুমি আমাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিলে কিন্তু পারলে না। তুমি আমার কষ্ট দেখতে চেয়েছিলে কিন্তু পারলে না। তুমি তোমার সুখ দেখাতে চেয়েছিলে কিন্তু পারলে না।

রাত দশটার সময় মিশুক ভাড়া করে লালামাটিয়া গেলাম। চলতে চলতে সিঁড়ি ভাঙ্গলাম। নীপা ভাবীর কলিং বেল চেপে ধরলাম।

নীপা ভাবীই দরজা খুলে দিলো। ঘরে ঢোকার আগেই নীপাকে

জড়িয়ে ধরলাম। 'ম্যাডাম, মাই সুইট ডার্লিং।'

গালে আবারও একটা থাপ্পড় পড়লো। ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিলো নীপা ভাবী। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেলাম।

উপুড় হয়ে পড়া অবস্থাতেই চোখ তুললাম, 'তুমি আমাকে মারলে? ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে মেঝেতে?' দুচোখ আমার পানিতে ভরে গেলো। ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইলাম নিপা ভাবীর মুখের দিকে।

'মাতালের উপযুক্ত ব্যবহারই করেছি। রোজ রোজ মদ খেয়ে জীবনটা নষ্ট করবে তুমি, আর আমি কিছু বলতে পারবো না?'

'আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করবো। তোমার কি? তোমার পয়সা খরচ করেছি? আমি আমার বাপের টাকায় মদ খেয়েছি। কার কি?' মেঝেতে পড়ে থাকা ব্যাগটা কাছে টেনে নিলাম।

'বের হয়ে যা তুই। এখনি বেরো বলছি। নষ্ট ছেলে কোথাকার।'

'যাবো না তো কি থাকবো নাকি? আমি কারো নই সেটা ভালো করেই জানি। উঠে দরজার কাছে এগোতে গিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিলাম। দেওয়াল ধরে সোজা হলাম। দরজার ছিটকিনিটা নিপা বন্ধ করে দিয়েছে। খুলতে গেলাম। তখনই পেছন থেকে আবারও নিপার কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

'সিমুল।'

ঘুরে দাঁড়ালাম।

'তুমি যাবে না।'

'কিছুতেই আমি থাকবো না।'

'তুমি থাকবে।' চিৎকার করে নীপা ভাবী কেঁদে ফেললো। 'আমাকে আর কষ্ট দিওনা সিমু।' আমাকে ওর নরম বুকে টেনে নিলো।

আমিও কেমন জানি হয়ে গেলাম।

নিপার বুকের মাঝখানে মুখ রেখে আমিও কেঁদে ফেললাম। আমার ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছা করলো কেন বুঝি না। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্রইং রুমে অনেকক্ষণ কাঁদলাম।

'যাবে না তো সিমু?

'এমন নরম বুক ছেড়ে?'

'দুষ্টু কোথাকার।'

'সত্যি নিপা, ইচ্ছা করে সারাটা জীবন তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদি।'

'হ্যাঁ আমার ব্লাউজটা সারা জীবন ভেজাও আর কি।'

'শুধু ব্লাউজ ভিজিয়েছি, আর কিছু ভেজেনি তো?'

'সিমু।' শাসনের সুর নীপার কণ্ঠে। 'আমার সাথে তুমি অমন কথা কখনও বলবে না। আমাদের সম্পর্কের সীমা অতিক্রম করতে যেও না। আমার কষ্ট হবে তাহলে।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, তোমার বুকটা ভেজাতে পারলেই হবে।'

'ঠিক আছে তোমার জন্য এ বুকটা সারাজীবন থাকবে। তোমার যখন খুশী ঝাঁপিয়ে পড়ো।

'তা বোধ হয় আর হবে না।'

'কেন ?'

'কাল বলবো।' ধপাস করে কার্পেটে আছড়ে পড়লাম। 'আমার খুব খারাপ লাগছে নীপা। আমাকে আর টানাটানি করো না।'

'তুমি কি এখানে শোবে নাকি ? ভাত খাবে না ?'

'আমার খুব খারাপ লাগছে। প্রচুর মদ খেয়েছি তুমি বিরক্ত করো না। একটু ঘুমুতে না পারলে মরে যাবো আমি।'

'তা বিছানায় চলো।'

'প্লিজ ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি। বাতিটা নিভিয়ে দাও।'

সকাল হয়েছে।

জানালা দিয়ে রোদ্র সরাসরি আমার মুখে এসে পড়েছে। মৃদু মৃদু গরম লাগছে। গা-হাত ব্যথা করছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। পাশ ফিরে আবার শুলাম। ঘুম ঘুম ভাবটা তখনও কাটেনি। চোখ আবারও জড়িয়ে এলো।

আমার মাথায় একটা নরম হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। হাতটা কপালে আলতোভাবে রাখা। হাতটা একবার আমার কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিলো। জানতাম নিপা ভাবীই হবে। আজ বৃহস্পতিবার দুর্গা পূজার ছুটি। না হলে এতক্ষণে তার অফিসে চলে যাবার কথা ছিলো। নিপা ভাবী কোন কথা বলছে না, কৌতূহল হলো। কিন্তু ঘুম ঘুম ভাবটা অনেক বেশী লেগে ছিলো আমার দু'চোখে। কোন কথা না বলেই চুপচাপ শুয়ে রইলাম।

ঘুম যেন কিছুতেই ভাঙতে চাইছে না। মাথাটা তখনও ঝিমঝিম করছে। দু'পা ব্যথা করছে। গতকাল যথেষ্ট হেঁটেছি। মদও খেয়েছি অনেক। মাথার দোষ কি? সারারাতের ঘুমেও এলকোহলের প্রভাব কাটাতে পারিনি।

জানালা দিয়ে রোদ এসে পিঠে পড়ছে। সারা পিঠ ঘেমে যাচ্ছে। রোদটার ওপর খুব রাগ হচ্ছে। কিন্তু করা কি? মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে শব্দ পাচ্ছি।

'ওঠো'

'কে?' ধড়মড় করে উঠে বসলাম। সামনে কার্পেটের ওপর বসে রয়েছে সোনিয়া। ওর দৃষ্টিটা ক্লান্ত, দূরের দেওয়ালে নিবদ্ধ ওর হাতে একটা ফুলের গোছা। আমার প্রিয় রজনীগন্ধা। জানি, আসার পথে নিশ্চয়ই সাইন্স ল্যাবরেটরির মোড় থেকে কিনেছে। আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো ফুলগুলো। ওর চোখের সঙ্গে আমার বারেকের জন্য চোখাচোখি হলো।

'কেন এমন পাগলামো করছো?'

ওর কথাটার উত্তর আমার জানা কিন্তু দিতে ইচ্ছা হলো না ইচ্ছাকৃত ভাবেই এড়িয়ে গেলাম।

'তুমি কেমন আছো?'

'ভালো।' অস্ফুট স্বর সোনিয়ার।

'নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছো কেন সিমুল?'

'আমার জন্য তোমার কষ্ট হয় না সোনি?'

লক্ষ্য করলাম নিপার ঠোঁট জোড়া কেঁপে উঠলো। আমার হাতে

ধরা ফুলের একটা পাপড়ি ছিঁড়ে নিলো। হাতটা ওর কাঁপছে। ঘামছে মেয়েটা। কি জবাব দেবে উত্তর খুঁজছে।

'থাক, বলতে হবে না। আমি জানতাম তোমার ভুল একদিন ভাঙ্গবেই। তুমি একদিন জানতে পারবে—'

'থাক ওসব কথা।'

আমাকে থামিয়ে দিলো।

'তুমি আর মদ খাবে না। ওমন পাগলামী আর করতে পারবে না।'

'মাই সুইট হার্ট।' ইচ্ছা করছিলো ওর মুখে একটা চুমু এঁকে দেই। ওর নাকের ডগায় জমে থাকা ঘাম আমার মুখের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাক। পারলাম না। নীপা ভাবী ঢুকলো।

'তুমি কি আমার ড্রইং রুমটাকেই বাসর বানাবে নাকি?'

'বানাবো বানাবো মাই সুইট ভাবী। আমার সুইট হার্টকে ফিরে পেয়েছি। আমার ইচ্ছা হচ্ছে নাচতে। আমি জানতাম আমার সুইট হার্ট আমাকে ছেড়ে থাকতেই পারবে না।'

জড়িয়ে ধরলাম নীপা ভাবীকে।

'তাহলে আর মদ খাবেনা তো?'

'তোমার কি মনে হয়?'

'যাও মুখ হাত ধুয়ে এসো। বেচারী সোনি তোমার দুঃখে ক'দিন কিচ্ছু খাইনি। আজও নাস্তা না করেই বেরিয়েছে। যাও তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে এসো, এক সাথে নাস্তা করবো আমরা।'

লাফিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। মনটা আজ আনন্দে নাচছে।

আমার সব অভিমানের ইতি হয়েছে। সোনি আমার কাছে এসেছে। কিন্তু ও ঠিকানা জানলো কি করে? বেচারী অনেক খুঁজেছে, অনেক কেঁদেছে। হয়তো অনেক সময় অভুক্ত থেকেছে।

বাথরুমেই মনে পড়লো আমার ব্যাগটা কোথায়? যত দূর মনে পড়ে সাথে করে নিয়েই এসেছিলাম। ব্যাগে সব কাগজপত্রগুলো আছে। মুখ না ধুয়ে ব্রাশটা মুখে নিয়েই বের হয়ে এলাম।

পর্দার আড়ালে থাকতেই ওদের কথাবার্তা কানে এলো।

সোনি: পারবো না ভাবী।

নীপা: তোমাকে পারতেই হবে। ওকে বাঁচাতে হবে।

সোনি: আমি ওকে ঘৃণা করি। ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমি সিমুলকে অন্তর থেকে ঘৃণা করি।

নীপা:—দেখো সোনি, ছেলেমানুষি করো না। তুমি এ মুহূর্তে অভিনয় করো। না হলে ওকে বাঁচানো যাবে না। ও যে তোমাকে কতটুকু ভালোবাসে তুমি জান না।'

সোনি: আমি শুধু আপনার অনুরোধ রক্ষা করতেই এসেছি। আপনি কসম না দিলে আমি কিছুতেই আসতাম না। আমাকে দিয়ে আর মিথ্যাভিনয় করাতে পারবেন না।'

আমার মাথাটা বোঁ করে যেন ঘুরে গেলো এক পাক। হু হু করে বুকটা যেনো খালি হয়ে যাচ্ছে। দেহের হাড়গোড় খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে মনে হলো। আরো ক'টা কথা নিঃশব্দে শুনে গেলাম।

নীপা: তুমি এতো নিষ্ঠুর কেন হচ্ছো সোনি?

সোনি: সে আমি আপনাকে কিছুতেই বলতে পারবো না।

নীপা : ওকে ক্ষমা করে, বাঁচানো যায় না সোনি ?

সোনি : এখন আর তা সম্ভব নয়।

নীপা : ওকে তুমি ছাড়া কি করে সুস্থ করবো সোনি ? ছোট বোন আমার, কথাটা বুঝতে চেষ্টা করো। আমি ওকে দারুণ স্নেহ করি। তোমাকে অনেক কষ্টে খুঁজে এখানে এনেছি।'

সারা শরীর আমার অবশ হয়ে আসছে। পা কাঁপছে। পায়ের কাঁপুনিতে চেয়ারটা হড় হড় করে একটু সরে গেলো। আমি আর লুকিয়ে থাকি কেন ? পর্দা সরিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালাম।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো দু'জন। এতো তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে বের হবো আশা করেনি। সোনির সামনে দাঁড়ালাম। ওর মুখের দিকে বিশ সেকেণ্ড অপলক চোখে চেয়ে রইলাম। মনে হচ্ছে দোতলাটা ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকালাম। না দোতলা ঠিকই আছে।

ধীরে পায়ে এগিয়ে এলাম। ফুলের গোছাটা তুললাম। ওর হাতের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। 'নীপা ভাবী বুঝতে পারেনি। আমার প্রতি অত্যাধিক স্নেহে অন্ধ হয়েই তোমার কাছে নিজেকে ছোট করেছে। নীপা ভাবীর এমন কোন অযোগ্যতা নেই যা দিয়ে তোমার কাছে নিজেকে ছোট করাতে পারেন। আমি নীপা ভাবীর হয়েই দুঃখ প্রকাশ করছি।'

'সিমুল।'

'নীপা ভাবী আপনি নিশ্চয়ই চান না আমি চিরকালের জন্য আপনার মুখ দেখা বন্ধ করি।' মুখটা সোনির দিকে ফেরালাম।

'তুমি এখন এসো। ফুলটা নিয়ে যাও। সামনের মোড়ে একটা ডাষ্টবিন আছে। নেড়ী কুকুরগুলো ছেঁড়া রুটির পরিবর্তে একগোছা রজনীগন্ধা দেখে আমার চেয়ে অনেক বেশী আশ্চর্য হবে।'

চোখ বন্ধ করে রাখলাম। মাথাটা ঘুরছে। সোনির দিকে তাকাতেও ঘৃণা হচ্ছে। শব্দ পেলাম। ও চলে যাচ্ছে। প্রতিটা শব্দ মগজে টোকা দিচ্ছে। দু'কান চেপে ধরলাম। সোনির কোন শব্দই আমার কানে যেন না ঢোকে।

মাত্র একদিন পর।

একটু এখানে থামো টাক্সি ড্রাইভার।'

'এখানে?'

'হ্যাঁ নীপা ভাবী মায়ের সঙ্গে দেখা না করে আমি যেতে পারছি না। আর এদেশে ফেরার ইচ্ছা আমার নেই। যদি মায়ের সঙ্গে আর দেখা না হয়।'

নীপা ভাবী আক্ষেপ করলো, 'এইতো ভালো ছেলের মতো কথা। তোমাকে আগেই বলেছিলাম কথাটা। যাক সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে তাহলে। আমাদের আর একটু আগে বোরানো উচিত ছিলো। তুমি তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু তোমার ফ্লাইট ৯টা ৪৫ মিঃ মনে আছে তো?'

'আমি যাব আর আসবো। শুধু মায়ের পা ছুঁয়ে সালাম করে আসবো। মাকে কথাটা জানিয়ে আসবো।'

আমি একটা রিকশা নিয়ে গার্ডেন রোডে ঢুকে পড়লাম। সোনিদের বাড়ীর ছাদে চোখ পড়লো। দুটো মাথা চোখে পড়লো। জানি,

সকালে ওরা দু'বোন অনেকক্ষণ ছাদে হাঁটে। বাবা যেমন ফুলের বাগানে হাঁটেন আটটা পর্যন্ত।

আমি রিক্সা থামিয়ে আমার গেটের দরজায় টোকা দিলাম। চাকর এসে দরজা খুলে দিলো। আমি দ্রুত গেটের ভেতর ঢুকলাম।

'কি চাও?' বাবা আমার সামনে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন।

'মায়ের সঙ্গে একটিবার দেখা করতে এসেছি।'

'চোর ছেলের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। গেট আউট।' বাবা দু'পা এগিয়ে এলেন।

'আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'দেখা হবে না।'

'দেখা করবোই।'

'ইউ ব্লাডি।' বাবা আমার গলার কাছে ধরে ধাক্কা দিলেন। 'গেট আউট।'

আমি আচমকা ধাক্কা খেয়ে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। বাবা লাথি তুলে আমার পাঁজরে সজোরে মারলেন। আমি কাতরে উঠলাম। লেগেছিলো বেশ। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাবার রক্ত মাথায় উঠে গেছে তখন। প্রেসার আছে জানি। আমার পশ্চাৎদেশে আবারও লাথি মারলেন।

'চোর তুমি, আমি ত্যজ্য করলাম তোমাকে।'

আমি গেটের বাইরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। বাবা গেট বন্ধ করে দিলেন। মা'র সঙ্গে দেখা হলো।

রিক্সাওয়ালা আমাকে ধরে দাঁড় করালো। আমি চোখের পানি

মুছলাম। রিক্সায় উঠে বসলাম। দেখলাম সোনি আর রিনী ছাদে দাঁড়িয়ে বাপ বেটার নাটক উপভোগ করছে। খানিকটা লজ্জাও লাগলো। রিক্সা দ্রুত চলতে শুরু করে কিছুটা হাত থেকে লজ্জার বাঁচালো।

নীপা সব শুনলো। দুঃখ পেলো। তবুও আমাকে পিছন ফিরতে বললো না। ট্যাক্সিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে বললো। আমি যেন একটা ছোট টেনিস বল। যে যেদিকে ছুঁড়ছে আমি সেদিকে ছিটকে পড়ছি। জানি না ভাগ্যে কি আছে আমার।

সোনিয়া, মা, বাবা, ভাই, সবার মুখ পিছনে রেখে আমি এগিয়ে চললাম জিয়া আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের দিকে।

পনেরো

ছাদের ওপরই ওদের তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেলো।

রিনি ঃ সিমুলের এই দুরবস্থা দেখে তোমার খুব আনন্দ লাগছে নিশ্চয়।

সোনিয়া চুপ। মুখে কথা সরছে না। সিমুলের বাবা ওকে লাথি মেরেছে। চোর বলেছে। ত্যাজ্য করবে। সবই শুনেছে। চোখ দুটো ছলছলে ওর।

রিনি : সিমুলের জীবনটা নষ্ট করার জন্য তুমি দায়ী।

সোনি ঃ আমি!

রিনি ঃ একটা কথা সত্য করে বলতো বোন, তুই কি সাইমনকে ভালোবাসিস?'

সোনি ঃ না।

রিনি ঃ তাহলে ধরে নিচ্ছি, তুই সিমুলকেই ভালোবাসিস। তাহলে ওকে এভাবে তিলে তিলে ধ্বংস করছিস কেন? ও যে অন্ধ-ভাবে তোকে ভালোবাসে তা তুই জানিস না। কিন্তু আমি জানি।

সোনী : তুমি তো আরো অনেক কিছু জানো। সোনিয়া চোখ মুখ ভেংচে অন্য কিছু ইঙ্গিত করলো।

রিনী : মিথ্যা কথা। ও কখনই আমাকে ভালবাসে নাই। আমার সঙ্গে ওর কোন দৈহিক সম্পর্ক ছিলোনা। আমি মিথ্যে বলেছিলাম। তুই ওকে আঘাত করার আগে পর্যন্ত সিমুল নষ্ট হয়নি। আজ ও নষ্ট কিন্তু সে তোর কাছ থেকে আঘাত পেয়েই।

সোনি : সত্য বলছো রিনি'পা ?'

রিনি : হ্যাঁরে হ্যাঁ। তুই এখনও পারলে ওকে ফেরা, নাহলে ও শেষ হয়ে যাবে। বাঁচবে না।

সোনীর পৃথিবীটা যেন দুলছে। চোখে যেন অন্ধকার দেখছে। একি শুনছে ও ? সিমুলকে কি তাহলে ভুল বুঝেছিলো ও ? সিমুল শুধু ওকেই ভালবাসে ? সেদিনও সে অপমান করেছে ওকে। সিমুলকে ফেরাতেই হবে। সিমুলের জন্য ওর কষ্টও কম হচ্ছে না।

একছুটে নিচে নামলো। নীপা ভাবীর বাসায় ফোন করলো। অনেকক্ষণ রিং হলো। নীপা ভাবীর মা ফোনে জানালেন, হেনা সিমুলকে নিয়ে এয়ারপোর্টে গেছে।

সোনি নিজের রুম থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে দুমদাম করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নেমে এলো। ও যাবে এয়ারপোর্টে। কিন্তু কে বিদেশ যাচ্ছে ? হেনাভাবী না সিমুল ? জানে না ও। হয়তো এমনও হতে পারে--কাউকে রিসিভ করতে অথবা সি-আপ করতে ওরা দু'জন গেছে।

ট্যাক্সির মধ্যে কতকিছু ভাবলো ও। সিমুলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও। ক্ষমা চাইবে। কি ভুলটাই না ভাঙ্গলো আজ। রিনী'পার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক আছে ভেবে কি অবিচারটাই না

করেছে ও। কিন্তু সিমুল কি ওকে ক্ষমা করতে পারবে? আজও কি 'সুইট হার্ট' বলে আদর করে ডাকবে?

ট্যাক্সি এয়ারপোর্টে পৌছালো। দ্রুত ভাড়া মিটিয়ে ও লাউঞ্জে উঠে গেলো। চারপাশ দ্রুত খুঁজতে লাগলো। কাউকে নজরে পড়লো না।

সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলো। ক্যান্টিন। ক্যান্টিনের সব ক'টা টেবিলে খুঁজতে লাগলো। না এখানেও কেউ নেই। নীপা ভাবীর মা কি ভুল বললো? নাকি ওরা মিথ্যা বলে বেড়াতে বেরিয়েছে? মনটা খারাপ হয়ে গেলো।

ক্যান্টিনের পশ্চিম দিকের গ্লাসের সাথে সেঁটে এক মহিলার পিছনাংশ দেখতে পেলো ও। নীপা ভাবীর মতই মনে হচ্ছে।

এগিয়ে গেলো ও। হ্যাঁ নীপা ভাবীই। হাতে একটা কাগজ পড়ছে। দু'চোখ বেয়ে জল টপ টপ করে কাগজটার ওপর পড়ছে। সোনি পাশে দাঁড়িয়ে, নীপার খেয়াল নেই।

সোনি নীপা ভাবীর কাঁধের উপর দিয়ে কাগজটাতে নজর দিলো। হাতের লেখাটা খুব পরিচিত, পড়তে লাগলো ঃ

মা,

তুমি যখন এ চিঠি পড়ছো তখন তোমার সিমু তোমার কাছ থেকে অনেক দুরে। আমি আমেরিকাতে পড়তে চলে গেলাম। বাবার টাকাটা চুরি না করে আমার উপায় ছিলো না। আগে তো বাবার কাছে টাকা চেয়েছিলাম, দেননি।

বাবার টাকা আমি শোধ করে দেবো। পার্টটাইম চাকুরী করে

এ বছরের মধ্যেই বাবার টাকা পাঠিয়ে দেবো। আর মা, তোমার সঙ্গে বাবা আমাকে দেখা করতে দিলো না। না হলে তোমার পা ছুঁয়ে বলে যেতাম, আর মদ খাবো না। আর নিজেকে নষ্ট করবো না। পড়াশোনা ঠিক মতো করে মানুষের মতো মানুষ হবো। তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসবো, দেখো।

মাগো, তুমি তো আমার সবচে' আপন। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। মাপ করে দিও। আর সিমুর জন্য একটুও কেঁদো না। তাহলে আমেরিকাতে থেকেও তোমার জন্য কান্না পাবে। আমি বুঝতে পারবো ঠিকই।

মা একটা কথা, তুমি তোমার 'পিচ্চি বৌ'-এর ওপর কোন রাগ রেখো না। ও আমাকে ভুল বুঝেছে, তুমি আবার ওকে ভুল বুঝোনা। আমি তোমাকে বলেছি, ওর সঙ্গে আমার আড়ি হয়ে গেছে। ওর বিষনিশ্বাস থেকে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। জানো মা এ যুগের মেয়েদের মনটা খুব ছোট। ও আমাকে নষ্ট করতে, ধ্বংস করতে চেয়েছিলো, কিন্তু পারবে না। দেখে নিও। আমি এবার থেকে জীবন গড়বো।

মা নীপা ভাবীকে তোমার মেয়ে করে দিয়ে গেলাম। ও খুব করেছে আমার। মেয়েটা নিঃসঙ্গ। অসহায়, কিন্তু খুব ভালো মা। নীপা ভাবীর খোঁজ খবর নিও।

আসি। পৌঁছেই তোমাকে চিঠি দেবো। তুমিও লিখবে কেমন! আমার ঠিকানা কাউকে দেবে না। দোওয়া কোর তোমার সিমুকে।

এখানেই শেষ করছি।

ইতি,

তোমার সিমুল।

সোনিয়ার আত্মসম্মান লুটিয়ে পড়লো। মাটিতে মিশে গেলো। নিপা ভাবীর পেছন থেকেই নিরবে পা টিপে টিপে পালিয়ে এলো। দু'চোখ ওর জলে ভরে গেলো। 'এতবড় শাস্তি তুমি আমাকে দিয়ে গেলে সিমুল ? তোমার সুইট হার্টকে একবার বলেও গেলে না ? আমি তোমাকে আঘাত করেছি। কিন্তু তুমি আমাকেও আঘাত করলে না কেন ? আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে 'সুইট হার্ট' বলে বুকে টেনে নিলে না কেন ? পা দুটো কাঁপছে ওর। বুকের ভেতরে কে যেন হাঁতুড়ি পেটাচ্ছে। হৃদয়ের অভ্যন্তরে হু হু করে বাতাস শিষ দিচ্ছে। মাথা ঘুরছে। দুচোখ জ্বালা করছে। চোখের পানি চিবুক গড়িয়ে বুক পর্যন্ত নেমে আসছে। তুমি আমার প্রতি একরাশ ঘৃণা নিয়ে গেলে। আমাকে কত ছোটই না ভাবলে। জানি না তোমার সাথে আর কখনও দেখা হবে কি-না ? কিন্তু সিমু শুনে রাখো আমার দুর্ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত। আন্তরিকভাবে দুঃখীত। আমি তোমার কাছে ক্ষমাটুকু চাইতে পারলে আমার এতোটা গ্লানি থাকতো না। আমার সব অহংকার তুমি মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে গেলে।

এয়ারপোর্টের সামনের দীর্ঘ পথটা হাঁটতে শুরু করলো ও। হাঁটতে ভালো লাগছে। কানে প্লেনের শব্দ এলো। মাথা তুলে তাকালো ও। বৃহৎ প্লেনটা মাথার ওপর শেষ চক্কর দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সোনিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। কান্নার অস্ফুট স্বর কণ্ঠ ফুঁড়ে বের হলো। ডুকরে কেঁদে উঠলো ও। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করলো, 'সিমু দেখো, তোমাকে বিদায় দিতে তোমার সুইট হার্টের চোখের পানি আজ বাঁধ ভেঙ্গে

ফেলেছে। তোমার সব ঘৃণা বুকে ধারণ করে বুকটা আমার নীল হয়ে গেছে। তোমার সুইট হার্ট আজ আর সুইট নেই বিষক্রিয়ায় নীল বর্ণের হার্ট হয়ে গেছে।

মেঘের আড়ালে বিরাট লৌহ দানবটা সিমুলকে নিয়ে হারিয়ে গেলো। বিশাল আকাশ প্রকাণ্ড প্লেনটাকে ক্ষণিকেই গিলে ফেললো।' দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। রেখে গেলো শুধু স্মৃতি।

—ঃ শেষ ঃ—